বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ

কি ও কেন?

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

উৎসর্গ

"ধর্ম্ম শুধু নাহি রয় মালার জপনে,
নহে তার পূর্ণায়ন তিলক-সেবনে।
অশনে বসনে ধর্ম্ম কভু বাঁধা নাই,
কিম্বা শুধু দেবালয়ে তারে নাহি পাই।
চাই বটে মালা-ঝোলা, অশন-বসন,
দেবালয় রচনাও নহে অকারণ।
কিন্তু যদি আচরণ নাহি করে নর,
অনুষ্ঠানহীন হয়ে রহে নিরন্তর,
ত্যাগ, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য না করে পালন,
না করে কিঞ্চিৎ মাত্র সংযম-সাধন,
এমন জীবনে করা ধর্ম্মের বড়াই,
সার ছাড়ি খোসা হেন কেবল বৃথাই।
অতএব, ধরমের নিত্য আচরণ
করিতে উচিত হয়, ধার্ম্মিক যে জন।
ব্রত, পূজা, মহোৎসব আছে বারো মাস
তারি মাঝে ধরমের উজ্জ্বল প্রকাশ।
ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্রের গঠন,
ধর্ম্ম ছাড়া শুভঙ্কর নহে কদাচন।"—
এ বাণী ঘোষিলা যিনি তাঁরি প্রীতি-তরে,
সমর্পিণু এই গ্রন্থ সভক্তি অন্তরে।

ইতি—
দীন সন্তান

আশীর্ব্বাদ

পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক ও ভোগসর্ব্বস্ব শিক্ষা-সভ্যতার প্রবল প্লাবনে হিন্দুর ঘরের চিরাচরিত পূজা, পার্ব্বণ ও ব্রতানুষ্ঠানাদি ভাসিয়া যাইতেছে। ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাংলা দেশই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্রুত বর্জ্জনপূর্ব্বক পরানুকরণ-প্রবণতায় যেন অধিক তৎপর। আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রপীঠ শহরগুলিতেই শুধু নয়, বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ব্রত-পার্ব্বণাদি অনুষ্ঠানের প্রতি জনগণের অনাগ্রহ ও অনাস্থার ভাব অধুনা প্রকট। কিছু সংখ্যক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারীর কল্যাণে এই ক্রমবর্দ্ধমান অনাস্থাশীল পরিবেশের মধ্যেও কোন মতে চিরাচরিত প্রথায় ব্রতপার্ব্বণগুলির গতানুগতিক উদ্‌যাপন সম্ভব হইতেছে।

আমাদের ঘরের ব্রতপূজা ও পাল-পর্ব্বণগুলি যে কর্ম্মবিরল জীবনের নিরর্থক অনুষ্ঠান মাত্র নয়, পরন্তু এইগুলির মধ্যেই যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ-চিন্তা নিহিত আছে, গভীর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য আছে, তাহা ঠিক মত জানা থাকিলে এই সকল ধর্ম্মীয় আচারের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব তিরোহিত হইত। আরো উল্লেখযোগ্য, এই পূজা-পার্ব্বণ ও ব্রতানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই একদা বাল্যকাল হইতে নরনারীর অন্তরে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হইত। বাল্যোত্তর জীবনে ঐ শ্রদ্ধাই ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া পিতা-মাতা, শিক্ষক, অধ্যাপক, পতি প্রভৃতি সকল গুরুজনের প্রতি আরোপিত হইয়া ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শৈক্ষিক ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া দেশের বৃহত্তর সমৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পূজা-পার্ব্বণ ও ব্রতানুষ্ঠানের এই সকল উপযোগিতা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এই সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিবার মত গ্রন্থও বড় নাই। "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ" গ্রন্থখানি সেই অভাব পূর্ণ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভারত সেবশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ধর্ম্মভিত্তিতে অখণ্ড জাতিগঠন চাহিয়াছিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিরাট সঙ্ঘের মাধ্যমে সমীচীন কর্ম্মধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি চাহিতেন, ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণাদি কি ভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং জাতীয় সংহতির ভিত্তিস্বরূপ হইয়া আজিও দাঁড়াইয়া আছে তাহার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা জনমনে আস্থার ভাব প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত করিতে এবং এই সকল ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে অবলম্বন পূর্ব্বক জাতিকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্, নীতিমান, বীর্য্যবান্ ও সংহতিবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিতে। আচার্য্যের অলক্ষ্য আশীর্ব্বাদপূত এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে সংগৃহীত ও পঠিত হইয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্বধর্ম্ম ও স্বসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ও একনিষ্ঠ করিয়া তুলুক, প্রাণে প্রাণে শ্রদ্ধাভাবের উন্মেষ করুক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির জাগরণের সহিত নরনারীর ভিতরে আধ্যাত্মিক চেতনা ফিরাইয়া আনুক—এই কামনা করি।

স্বামী যোগানন্দ, সহ-সভাপতি,
ভারত সেবাশ্রম সংঘ

গ্রন্থকারের নিবেদন

করুণাময়ের শুভ ইচ্ছায় "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ" প্রকাশিত হলো। কাজটি অতি বিরাট এবং জটিল। প্রথমতঃ নানা সূত্র থেকে ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণের সামগ্রিক তথ্যাদি সংগ্রহই এক দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত ঐ সব জটিল তথ্যকে সমন্বিত ও সুগ্রথিত করা অধিকতর কঠিন। তৃতীয়তঃ ঐ সব ব্রতাদি অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রহস্যোদ্ভেদ গভীর ধ্যান ও মননের বিষয়। এ সকল কাঠিন্যের কথা উপলব্ধি ক'রেও দুঃসাহসীর ন্যায় কেন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়েছি, সে কৈফিয়ৎ-ই অগ্রে দিতে চাই।

নানা ধর্ম্মমতের মিলনভূমি ভারতের বৃহত্তর ও অখণ্ডিত জাতীয়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত থেকেও আমাদের এক অবিরোধী স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আমরা হিন্দু। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ নিয়েই আমাদের হিন্দুত্বের মূল কাঠামো তৈরী। আমাদের সংসারে ব্রত, পূজা, পাল-পার্ব্বণ নিয়ত লেগেই আছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবনে ধর্ম্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে ব্যাপক ও সার্থক ক'রে তুলতেই সমাজহিতচিকীর্ষু আর্য্য ঋষি ও মনীষিবৃন্দ এ সকল ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির বিধান দিয়ে গেছেন। এগুলির কোনটিই নিরর্থক বা নিষ্ফল নয়। কিন্তু, বর্ত্তমানে বিদেশ থেকে আমদানী করা ধর্ম্মাদর্শবর্জ্জিত সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি তথা আধুনিক জড় বিজ্ঞানবাদের বিকৃত অনুকৃতি ধর্ম্মভূমি ভারতের অধিবাসিগণকে এমনই বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে যে, সমাজকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ঐ সকল সদনুষ্ঠানের প্রতি জন সাধারণের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আগ্রহ নৈরাশ্যজনক ভাবে হ্রাস পেতে বসেছে। অনেকে তো এগুলিকে কুসংস্কার ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগের পক্ষপাতী। কেউ কেউ বলেন—"এ সব সেকেলে, একালে লোকশিক্ষার রীতি ও ধারা অন্যরূপ।"

যাঁরা পুরুষপরম্পরাগত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে অদ্যাপি এগুলি কিছুটা ধ'রে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যেও এ সকল অনুষ্ঠানের উপযোগিতা ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। ফলে, এক দিকে যেমন হিন্দুর মধ্য থেকে হিন্দুত্বের চেতনা ও গৌরববোধের ক্রমাবলুপ্তি ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা, সত্য, শ্রদ্ধাদি মহনীয় গুণাবলীও লোকচরিত্র থেকে একে একে বিদায় গ্রহণ করছে। এ ঘোরতর সঙ্কট থেকে জাতির প্রাণসত্তাকে রক্ষা করা এ যুগের এক অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। কিন্তু, কি প্রকারে এ কার্যকে সম্ভব ক'রে তোলা যায়, সেটাই প্রশ্ন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত—হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচার ও হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির ব্যাপক প্রচলনের মধ্য দিয়েই হিন্দুর আত্মসম্বিৎ দ্রুততর গতিতে ফিরে আস্তে পারে এবং সমুদয় ভেদ-বিভেদ থেকে পরিমুক্ত এক অখণ্ড হিন্দু জাতীয়তার পুনঃ সংগঠনেরও এটাই যথার্থ পথ। হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন, ঐক্য, সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হ'লে মুসলমান-খৃষ্টান-শিখ-বৌদ্ধাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তার ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে পরিণামে ভারতে অভীষ্ট মহাজাতিগঠনের কার্য্য একান্ত সাফল্যমণ্ডিত হবে। কঠোর তপঃসাধনার মধ্য দিয়ে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এ সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠন আন্দোলনের। তদীয় আরব্ধ কার্য্য সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে আজো চল্‌ছে সর্ব্বত্র। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতে ও বহির্ভারতে বিপুল আবর্ত্তের সৃষ্টি ক'রে তাঁর মহৎ আন্দোলনের উত্তাল প্রবাহ উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব তদীয় ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠন আন্দোলনের এই বিরাট কর্ম্মপরিকল্পনার মধ্যে হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ মানসে দেশের সর্ব্বত্র ব্রত-পূজা ও পালপার্ব্বণাদি ধর্ম্মীয় আচারের ব্যাপক প্রবর্ত্তনের উপযোগিতা স্বীকার করতেন এবং এ সকলের অনুষ্ঠানেও প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। কিন্তু, তিনি কখনো চাইতেন না যে গতানুগতিক ধারায় বা অন্ধ অনুকরণবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে অথবা বিকৃত আকারে মানুষ ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান ও আচরণ করুক। কেন

না, তা'তে মানুষের যথার্থ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জাগে না এবং জাতীয়তাবোধের উপযুক্ত উন্মেষও ঘটে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং অন্ধ সংস্কারপ্রবণতাই বিশেষভাবে প্রশ্রয় পায়। তাই তিনি বলেছিলেন **—"ধর্ম্ম নাই মালায়-ঝোলায়, ধর্ম্ম নাই তিলক ফোঁটায়, ধর্ম্ম নাই মন্দিরে মসৃজিদে গীর্জ্জায়, ধর্ম্ম আছে আচরণে, অনুষ্ঠানে, অনুভূতিতে, ধর্ম্ম আছে ত্যাগে সংযমে সত্যে ব্রহ্মচর্য্যে।"**

তিনি সর্ব্বদাই চাইতেন—ভক্তির সঙ্গে মানুষের অন্তঃকরণে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ও ঘটুক এবং অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ ক'রে সেই শিক্ষার আলোকে তারা নিজ নিজ চরিত্রের সমুজ্জ্বল প্রকাশের নিমিত্ত যথার্থ আচার-নিষ্ঠ হোক। ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণের ভিতরে মনুষ্যজীবনের যে কল্যাণময় মহাসাধনার ধ্রুব সঙ্কেত রয়েছে, সে রহস্যের সম্যক্ উদ্ঘাটন তাই একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। কঠিন হলেও জাতীয় স্বার্থেই এ কাজের সূচনা করা অত্যাবশ্যক। এ কাজকে আর ফেলে রাখা যায় না। তাই নিজ অযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা সত্ত্বেও এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হয়েছি। ভরসা কেবল শ্রীগুরুকৃপা।

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, পূজা, উপাসনা, বারব্রত সবই এক বিশিষ্ট অধ্যাত্ম লক্ষ্যের পরিপোষক হয়েও বিচিত্র ও বহুমুখী। বৈদিক যুগে এত বিচিত্রতা ছিল না। দেবতা বহু ছিলেন এবং তাঁদের আবাহন ও আরাধনা একটি মাত্র ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্পাদিত হতো, তা হলো যজ্ঞ। পৌরাণিক যুগে দেবতারা বিশিষ্ট মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশিত হন এবং বিচিত্র প্রতিমা অবলম্বনে তাঁদের বিচিত্র পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়। ঠিক এ যুগেই আমরা বিভিন্ন পুরাণে বহুবিধ আশ্চর্য্য ফলের কীর্ত্তনমুখর নানা ব্রতোৎসব ও পাল-পার্ব্বণের সন্ধান পাই। পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল শাস্ত্রীয় ব্রত-পার্ব্বণ ব্যতীত আর এক প্রস্ত লোকায়ত অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে। এ ভাবেই দেবতার পর দেবতা, পূজার পর পূজা, ব্রতের পর ব্রত, উৎসবের পর উৎসবের শুভ আবির্ভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ গোটা হিন্দু-সমাজটিকে এক বিরাট ব্রতক্ষেত্রে বা পূজামণ্ডপে বা উৎসবভূমিতে পরিণত করে। এ সকল

ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণের ইতিহাস বিচিত্র, রূপ বিচিত্র, অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিচিত্র এবং রহস্য ও তাৎপর্য্যও বিচিত্র। এই বিচিত্রতার অপরূপ রূপময় চিত্রটি জনসমক্ষে যথার্থরূপে যিনি তুলে ধরবেন, সন্দেহ নেই, তিনি আমাদের পরম বান্ধব। আশার কথা, ব্রত-পার্ব্বণাদি সম্বন্ধে ছোটবড় কয়েক খানি সংগ্রহগ্রন্থ বাজারে চালু আছে। দু'একখানি ক্ষুদ্রায়তন গবেষণাপুস্তকও চোখে পড়ে। কিন্তু, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন, জাতীয় সংহতির পুনঃ সংগঠন এবং দেশের জনচরিত্রের দিব্য রূপায়ণের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে ধ্রুব তারার ন্যায় পুরোভাগে স্থির রেখে হিন্দুর ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির রহাস্যোদ্ভেদের চেষ্টা বড় একটা হয় নি। আলোচ্য গ্রন্থখানি সে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যের সূচনা মাত্র করতে চায়। এটাই সামগ্রিক আলোচনা, এ অযৌক্তিক দাবী লেখকের নেই।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, এই গ্রন্থরচনায় বাজারে প্রচলিত সংগ্রহ-গ্রন্থগুলি (পুঁথি, পাঁচালী প্রভৃতি) লেখককে প্রচুর সাহায্য করেছে। সেবা, সংগঠন ও প্রচার কার্য্যোপলক্ষ্যে পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ কালে নিষ্ঠাবতী ব্রতচারিণীদের অনুষ্ঠানপ্রকরণ চাক্ষুষ দর্শন ক'রে এবং তাঁদের নিকট অজস্র জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারাও বহু তথ্য আয়ত্ত করা গিয়েছে। তাছাড়া পুরাণ গ্রন্থগুলিও যথাসম্ভব অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ তিনটি প্রধান সূত্র থেকেই ব্রত-পার্ব্বণাদির উৎপত্তি, তাদের অনুষ্ঠানকাল ও অনুষ্ঠানরীতি এবং ব্রতফল ও ব্রতকথাদির বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি। বিষয়টি এতই বিশাল ও বহুপল্লবিত যে, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে হ'লে গ্রন্থের কলেবর অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা জানি—বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামের দিনে তথা নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের ভিতর মানুষের ধৈর্য্য কম. সময় কম এবং বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য যোগানোর মত আর্থিক সঙ্গতিও কম। সে জন্যই আলোচনার পরিসর সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। একই কারণে ঐ সকল ব্রত-পার্ব্বণাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে আমরা যথাসম্ভব বিরত হয়েছি। অনুষ্ঠানপ্রকল্পে একটি একটি ক'রে ঐগুলির আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি দেখানোও সম্ভব হয় নি। আমরা এমন এক পন্থা আশ্রয় করেছি, যাতে অল্প কথায় ও অল্প পরিসরে সামগ্রিক তাৎপর্য্যবোধের একটি

সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরা যায়। অর্থাৎ, জাতীয় জীবনে ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদি সদনুষ্ঠানের মিলিত আশীর্ব্বাদ কি ভাবে কার্য্যকর হয়ে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনাকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করে, সেইটিই আলোচ্য গ্রন্থের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। সাতটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে বক্তব্য শেষ হয়েছে। পরিশিষ্টে হিন্দু জনসাধারণের প্রতি কয়েকটি কার্য্যকর কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ সংযোজিত করা হয়েছে, যাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হয়ে অতঃপর অনুষ্ঠান ও আচরণের মাধ্যমে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার অন্ততঃ কিছুটা প্রকাশ বাস্তবে রূপায়িত হয়। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে বালবৃদ্ধ, কুমারী-বধূ, সধবা-বিধবা, যুবা-প্রৌঢ়, শিক্ষিত-অর্দ্ধশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বস্তরের হিন্দু জনগণের মধ্যে স্বধর্ম্মচেতনা ও জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রৎ হয়ে যদি ঘরে ঘরে ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রেরণা সঞ্চারিত হয় এবং ত্যাগ ও সংযমময় জীবনের প্রকৃষ্ট অনুবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনচিত্তে আস্তিক্যবুদ্ধি ও সদাচারনিষ্ঠা পুনর্জাগ্রৎ হয়, তবেই শ্রম সার্থক মনে করবো।

ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

: প্রতিষ্ঠাতা :

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে প্রণবায়

বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ

প্রথম অধ্যায়

[সূচনা]

আমাদের ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ প্রচলিত। অবশ্য "তেরো পার্ব্বণ" বাক্যটি লোকপ্রবাদ মাত্র। আসলে ব্রত-পার্ব্বণ অসংখ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিচিত্র আচার-বিচারসম্পন্ন অধিবাসীর মধ্যে কত বিচিত্র ধরণের ব্রত-পার্ব্বণাদির প্রচলন যে রয়েছে তার হিসাব রাখে কে? তেরোর পীঠে একটি বা দু'টি বা তিনটি শূন্য দিলেও সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যায় কিনা তা সন্দেহের বিষয়। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ও আচরিত ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির সামগ্রিক সংগ্রহ এক বিশাল দায়িত্ব। এ কাজ কেউ এখনো করেছেন ব'লে মনে হয় না। আমরাও ঠিক অত বড় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হই নি। মোটামুটি ভাবে বাংলার লোকায়ত ব্রত-পার্ব্বণ এবং বিভিন্ন পুরাণোপদিষ্ট ব্রতাদি নিয়েই কাজে নেমেছি। লোকায়ত অর্থ শাস্ত্রীয় মন্ত্রতন্ত্র ছাড়াই পল্লীর কুমারী, সধবা, বিধবা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষেরাও নিজস্ব আচারসিদ্ধ পদ্ধতিতে দেবারাধনামূলক যে সকল ব্রতোৎসবের আয়োজন ক'রে থাকেন তাদেরকেই বুঝতে হবে। জনসমাজে ও-গুলিই সমধিক প্রচলিত। তাই ও-গুলিকে লোকায়ত ব্রতোৎসবের পর্যায়ভুক্ত করছি।

পৌরাণিকই হোক বা লোকায়তই হোক—মনুষ্যের উন্নততর জীবনবোধের বিশালতর ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতের নানা প্রান্তে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মীয় উৎসব-পার্ব্বণাদির এক সাধারণ আবেদন রয়েছে। সে আবেদন সর্ব্বত্র একই। সুতরাং, ভারতের সকল প্রদেশের লোকপ্রিয় ব্রত-পার্ব্বণাদির সামগ্রিক সংগ্রহ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান না পেলেও যতটুকু আলোচনা এ গ্রন্থে সম্ভব তার ভিতর দিয়েই সমগ্র ভারত সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা আমরা লাভ করি। কারণ, ধর্ম্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মীয় আচারে সমগ্র ভারতের বিশাল হিন্দুজনগণ এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। একই প্রাণধর্ম্মে সকলের জীবন বাঁধা। পৌরাণিক ব্রতপূজাদি সর্ব্বত্রই প্রায় এক। লোকায়ত ব্রত-পার্ব্বণ সম্বন্ধে এক প্রদেশের

আচারের সহিত অন্য প্রদেশের আচারের কিছু বিভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার দিক থেকে পরস্পরের ভিতর গভীর ঐক্যসূত্র বিদ্যমান। যেমন বাংলার অম্বুবাচী এবং উড়িষ্যার রজোৎসব নামে ও আচারে ভিন্ন হ'লেও মূলতঃ দু'টি একই। একই সূর্য্যোপাসনার প্রেরণা থেকে বিহারের সুবিখ্যাত "ছট্ পরব"* এবং বাংলার সধবা মহিলাদের অমাবস্যা-ব্রত ও কুমারী মেয়েদের মাঘ মণ্ডলের ব্রতাদির উদ্ভব। এরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের উদ্দেশ্য ও রহস্য কি? মনুষ্য জীবনে ধর্ম্মার্জ্জনের বিশালতর ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতাই বা কোথায় এবং কতটুকু? এই প্রশ্নের সদুত্তরই নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে "ধর্ম্ম" বলতে কি বোঝা যায়, তা সঠিক বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা, এ জটিল ও বিশাল আলোচনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে অতলে থই হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম্মের এক চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন—যাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তা-ই ধর্ম্ম। মহর্ষির ভাষায়—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" অভ্যুদয় বলতে বুঝবো ঐহিক উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি, নিঃশ্রেয়স অর্থে পারলৌকিক কল্যাণ। একটি ভুক্তি, অন্যটি মুক্তি। হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্তমোক্ষবাদী নয়। যাঁরা বলেন হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুকে ইহবিমুখ করেছে তাঁরা বস্তুতঃ ভ্রান্ত বা একদেশদর্শী। অবশ্য মুক্তি বা মোক্ষই যে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, তা ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্য-বিজয়কে অস্বীকার ক'রে নয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গের সাধনাকে অঙ্গীকার ক'রেই হিন্দুধর্ম্মের মহিমময় পূর্ণাঙ্গ রূপ। ধর্ম্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মীয় সাধনার এই অখণ্ড সত্তাটির সম্বন্ধে হিন্দু ঋষি ও মনীষিবৃন্দ সচেতন ছিলেন। ইহকাল ও পরকাল এতদুভয়ের মধ্যখানে দুর্ল্লঙ্ঘ্য লৌহপ্রাচীরের শক্ত আবেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে তাঁরা একটিকে অন্যটির থেকে পৃথক্ ক'রে ফেলেন নি, বরং ভ্রান্তবুদ্ধি মানুষের কল্পিত ভেদরেখা মুছে ফেলে দিয়ে দু'এর মধ্যে এক সুখকর সমন্বয়ের সেতু রচনা করেছেন। মানুষ ইহজগতে সুখী,

* ষট্ পব্ব'—দেওয়ালী অমাবস্যার পর পঞ্চমী ও ষষ্ঠী দিবসে অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধিশালী এবং সৌভাগ্যবান্ তো হবেই, পরলোকেও লাভ করবে নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়ঃ—এমন যোগযুক্ত কৌশলেই তার সমুদয় চিন্তা, প্রচেষ্টা, কর্ম্ম ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করা চাই। এমনটি হলেই ঐহিক এবং পারত্রিক ব্যাপারের মধ্যকার বিরোধ চিরতরে মীমাংসিত হবে। ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও মনীষীরা তাঁদের দিব্য উপলব্ধির উন্নত ভূমিতে অধিরোহণ ক'রে সমগ্র মনুষ্য জাতির কল্যাণকল্পে জীবনসাধনার বিশিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক সে মীমাংসাই দিয়ে গেছেন। হিন্দুর ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির তাৎপর্য্যবোধের ভিতরে ভারতীয় মনীষার সেই সাফল্যমুখী কৃতিত্বের এক বিশেষ মহনীয় পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি। মানুষের জৈব স্তরে তাকে ভৌতিক কামনাসিদ্ধির সমুদয় আবশ্যকীয় উপকরণসম্ভারে সুপরিতৃপ্ত ক'রে ক্রমে কৌশলপ্রযুক্ত উপায়ে তার কামনা-বাসনার ক্ষয় সাধন দ্বারা পরিণামে সেই একই মানুষটিকে অধ্যাত্ম চেতনার বিশিষ্ট ভূমিতে উন্নীত করার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই তাঁরা বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের মাঙ্গলিক বিধান প্রচার করেছিলেন। ভুক্তি ও মুক্তি, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—দু'এর সাধনাই এখানে সুষম গতিতে, অবিমিশ্র ধারায় এবং একে অন্যের সঙ্গে অনুপূরক ও পরিপূরক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে অবশেষে এক অনিবার্য্য মহত্তম সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর। ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির রহস্যধারা এই এক বিশেষ সত্যানুভূতিকে মধ্য বিন্দু ক'রেই আপন বিপুল পরিধিপথে পরিক্রমণশীল। সমস্ত বৈচিত্র্যময় সুরবিতানের মধ্যে বংশী বিশেষের এই এক পোঁ। সমস্ত ভাষা ও ভাবব্যঞ্জনার এই এক মর্ম্ম। সামগ্রিক আলোচনারও এই এক ফলশ্রুতি।

উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ভেদে সমুদয় ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণগুলিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ—

(১) প্রতিটি ব্রত, পূজা ও পাল-পার্ব্বণই শ্রদ্ধানিষ্ঠ ব্যক্তির নৈতিক, ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রগঠনে প্রভূত সাহায্য ক'রে থাকে। বিশেষতঃ কতকগুলি ব্রত, পূজা, পাল-পার্ব্বণ আছে, যেগুলি বয়স ও অধিকারী-বিচার অনুসারে বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগঠনের জন্যই পরিকল্পিত ও প্রবর্ত্তিত। কুমারীব্রত ও সধবাব্রতের বিচিত্র অনুষ্ঠানাবলী এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) কতকগুলি ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণ আছে, যেগুলি সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় পারিবারিক জীবন গঠনে একান্ত ভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সেগুলি পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী, শ্বশ্রূ-পুত্রবধূ প্রভৃতির ভিতর পরস্পর সম্বন্ধ কি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের

আচরণবিধি কিরূপ হওয়া উচিত, কি উপায়ে পরস্পরের সহিত স্নেহ-প্রীতি ও সেবা-শ্রদ্ধার মধুর সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক সংসারের পরিবেশকে সুস্থ ও মধুময় ক'রে তোলা যায় তা শিখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। ব্যষ্টিচেতনা থেকে কর্ত্তব্য ও দায়িত্বময় পারিবারিক চেতনার ত্যাগ ও সেবানিষ্ঠ স্তরে উন্নীত করতে এই শ্রেণীর ব্রতানুষ্ঠান ও পাল-পার্ব্বণের দান অপরিসীম।

(৩) কতকগুলি ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণ আছে, যেগুলি সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ সাধনের নানামুখী অভীপ্সাকে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রভূত নৈতিক প্রেরণা সঞ্চার করে। অর্থাৎ, সেগুলির মধ্যে কৃষি-বাণিজ্যের সমুন্নতি, শিল্প-শিক্ষাদির প্রসার, সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যের সংগঠন, প্রতিরক্ষার বীর্য্যের উদ্বোধন সঞ্চার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রশ্নগুলি বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। পারিবারিক স্বার্থ ও কর্ত্তব্যের ঊর্দ্ধে প্রতিটি ব্যক্তির যে আরো এক বৃহত্তর স্বার্থ ও কর্ত্তব্য আছে, তা এই শ্রেণীর ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান সমুদয়ের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। এগুলি আমাদিগকে সমষ্টিচেতনার অধিকতর উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

(৪) আর এক শ্রেণীর ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণ আছে, যেগুলি থেকে পাওয়া যায় গভীর আশ্বাস ও অভয়—রোগে, শোকে, আধি-ব্যাধিতে, দুঃখে ও দুর্দ্দৈবে। জীবনসংগ্রামের কঠিন আবর্ত্তে পড়ে মানুষ যখন দিশেহারা, তখন আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রতচারী বা ব্রতচারিণীকে এ-গুলি যথেষ্ট নৈতিক ও আত্মিক বলে উজ্জীবিত করে—তাঁদের অন্তরে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ থেকে পরিত্রাণের অমিত ভরসা জাগিয়ে তোলে।

(৫) কুমারী-ব্রতকল্প ও সধবা-ব্রতকল্প সমেত প্রায় সমুদয় ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানই মনুষ্য সমাজকে ধীরে ধীরে অথচ অতি সুকৌশলে প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রবাহমুখ থেকে প্রত্যাবৃত্ত ক'রে তাকে সোপানানুক্রমে পরম নিবৃত্তিধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, সংসারের শত প্রকার প্রলোভন, স্বার্থবুদ্ধি ও ভোগেচ্ছার মধ্যেও মানুষকে ত্যাগ ও সংযমের শিক্ষায় সুশিক্ষিত ক'রে তোলে এবং পরিণামে তাকে ভূমার চৈতন্যে উন্নীত ক'রে পরা মুক্তির অধিকার দান করে।

অর্থাৎ, হিন্দুর ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণ সমুদয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠনের অভীষ্ট উপাদানে সমৃদ্ধ তো বটেই, ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের সকল সম্ভাবনাতেও তা পরিপূর্ণ। অধ্যায়ের পর অধ্যায়ের আলোচনায় সে কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্রতপূজার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং ব্রতের ছড়া ও কাহিনী লক্ষ্য ক'রে মনে হতে পারে, সেই বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠানগুলি বুঝি নিতান্তই অর্ব্বাচীন। কিছুটা তাচ্ছিল্য ভাবও আসতে পারে। কিন্তু, কোনও রূপ বিরূপ মনোভাব পোষণের পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত অধিকারবাদের কথা ভেবে দেখতে হবে। সমাজে নানা বয়সের, নানা প্রকৃতির, নানা রুচির মানুষ বাস করে। সকলের মেধা ও গ্রহণশক্তি সমান নয়। অথচ, আর্য্য ঋষিদের লক্ষ্য ছিল সকল স্তরের সকল অধিকারীর মানুষকেই ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মতত্ত্বের উন্নততম ভূমিতে পৌঁছে দেওয়া। সেটা করতে হলে অধিকারবাদের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েই করা চাই। যে যেমন অধিকারী, যার যেমন রুচি ও প্রকৃতি, যে যতটা বুঝতে পারে, তাকে প্রথমে সেই স্তরের উপযোগী উপাসনা ও অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়ে ক্রমে তার মেধা, জ্ঞান ও গ্রহণশক্তির উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে উন্নততর তত্ত্ব ও সাধনায় দীক্ষিত করলে তবেই তা সার্থক হয়। যার বর্ণবোধই হয়নি, তাকে এম-এ ক্লাশের বই পড়তে দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। একটির পর একটি ক্লাশ পড়িয়ে একদিন তাকে শিক্ষার উন্নততম সোপানে তোলা যায়। ধর্ম্মীয় সাধনার ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। অন্ততঃ ভারতের ঋষিরা এ দৃষ্টান্তের অনুসরণে ক্রমদীক্ষায় অতি নিম্নস্তরের মানুষকেও অধ্যাত্ম জ্ঞানের আলোকদীপ্ত লোকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং এ চেষ্টায় তাঁরা যে সফলও হয়েছেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এ সকল বিষয় মল্লিখিত "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয়েছে। যাঁরা বিশেষ আগ্রহী ও তত্ত্বান্বেষী তাঁরা উক্ত গ্রন্থখানি সংগ্রহ ক'রে পড়ে নিতে পারেন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা দেখবো, কত ন্যূনতম অবস্থা থেকে ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম-সাধনার আরম্ভের কল্পনা করতে পেরেছে। পাঁচ বৎসর বয়সের বালিকা, যার বাক্‌স্ফূর্ত্তিও ভাল ক'রে হয়নি, যার বায়না কেবল রঙিন্ পুতুল বা খেলনায়, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যার কোন জ্ঞানই ফুটেনি, তাকেও ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে দূরে রাখা হয়নি। সেই পুতুল খেলার স্তর থেকেই তাকে ধর্ম্মীয় ব্রতসাধনার মার্গে সুকৌশলে আকর্ষণ করা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের উন্মেষ যতই হয়েছে, ততই

নব নব রুচিকর ও উপযোগী ব্রতপূজায় তাকে দীক্ষিত ক'রে তার জীবনটিকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার চেষ্টা হয়েছে। আমরা দেখবো—জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত ঐ মহিলাটি ব্রতপরায়ণা। সমগ্র জীবনটাই তাঁর ব্রতময়। শুধু নারীকে নয়, পুরুষকেও এই ক্রমদীক্ষার সাহায্যেই অধ্যাত্ম জ্ঞান দান করা হয়। তবে তার রীতি-প্রকৃতি কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের, তা পরে বল্‌বো। এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, শুধু ব্যক্তিকে নয়, এ অধিকারবাদ ও ক্রমদীক্ষার সুবিধার বলেই বহু বহু জড়োপাসক অনার্য্য জাতিকে পর্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছিল। জড়োপাসকগণের প্রস্তর, মূর্ত্তি ও বৃক্ষপূজা নূতনতর অধ্যাত্ম তাৎপর্য্যে সুশোভিত হয়ে নবরূপ পরিগ্রহ করে; ভূতোপাসকগণ ভূতনাথের সন্ধান লাভপূর্ব্বক জীবনে আপ্তকাম হন। সুতরাং, অর্ব্বাচীন বোধে কোনও ব্রত বা পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠানকে যদি আমরা অবহেলার দৃষ্টিতে দর্শন করি, তবে তা ভুল করা হবে। আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য নানা স্তরের ব্রত-পার্ব্বণের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হবো। সামগ্রিক আলোচনার ভিতর দিয়ে একটি সামগ্রিক সার্থকতার বর্ণাঢ্য চিত্র আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। আশা করি, পাঠকগণ ধৈর্য্য অবলম্বন করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে যে পাঁচটি ধারা স্থির করা হয়েছে, এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্ট ধারাপথ অনুসরণ ক'রেই প্রস্তাবিত গ্রন্থের শুভযাত্রা আরম্ভ হোক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমারীর ব্রতচর্য্যা ও ব্যক্তিজীবনে চরিত্রনীতির শিক্ষা

প্রথমেই আমরা আলোচনা করবো—ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশে ও জীবন গঠনে ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণের অপরিসীম দানের কথা। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই পরিচয় ঘটে কুমারী-ব্রতকল্পের সঙ্গে, তৎপরে সধবা-ব্রতকল্পের। একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হতে পারে যে, কুমারী ও সধবা উভয়েই তো নারী, তা হলে ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণগুলি কি পুরুষদের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধার্ম্মিক জীবন গঠনে কোনও সাহায্য করে নি? শুধু নারীদের জন্যই কি এত রকম-ফের ব্রত-পার্ব্বণ পরিকল্পিত? নারী ও পুরুষ উভয়েই তো সমাজের সমান অংশীদার। উভয়কে সমানভাবে ও সম আদর্শে না গড়ে তুললে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল কোথায়? প্রশ্নটি খুবই যুক্তিযুক্ত।

ব্যক্তিগঠনের দু'টি ধারা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানব সমাজ গঠিত, তা সকল বিতর্কের অতীত। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে এই—নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠন এবং প্রকৃতি ও কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র কি এক? তা কখনো নয়। উভয়ের মধ্যে এসব দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যা পুরুষদের পক্ষে উপযোগী, তা নারীদের পক্ষে সর্ব্বাংশে নয়; যা নারীদের পক্ষে উপযোগী, তা পুরুষদের পক্ষে সর্ব্বাংশে নয়। সুতরাং, উভয়ের ব্যক্তিগত জীবন গঠনের উপায়ের মধ্যেও বিজ্ঞানসম্মত কিছু কিছু পার্থক্য থাকা খুবই সঙ্গত। অর্থাৎ, ব্যক্তির গঠনের ক্ষেত্রে দু'টি ধারা অনুসরণ করা উচিত—একটি পুরুষদের জন্য, অন্যটি নারীদের জন্য। ভারতবর্ষে তাই করা হয়েছে। পুরুষদের আত্মবিকাশ ও জীবন গঠনের জন্য কিশোর বয়সেই তাদিগকে প্রেরণ করা হতো ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুগৃহে। সেখানে তাঁরা ত্রিসন্ধ্যা অগ্নিহোত্র সম্পাদন করতেন, গুরুর পরিচর্য্যা ও আদেশ পালন করতেন, কঠোরভাবে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন, বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রীয় চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকতেন এবং নানা বৈষয়িক বিদ্যা অর্জ্জন ও চরিত্র গঠনের প্রভূত সাহায্য পেতেন। ঐ ছিল তাঁদের জীবনব্রত। বস্তুতঃ পুরুষেরাও আশৈশব ব্রতচারী। কিন্তু, নারীরা গুরুগৃহে শিক্ষালাভে এ ধরণের সুবিধা পেতেন না। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র ভাবে ভাবতে হয়েছে। তাঁরা পিতৃগৃহে থেকেই বিদ্যার্জ্জন করতেন এবং পিতামাতার শুশ্রূষা,

অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, নানা গৃহস্থালীয় কার্য্যে প্রবীণাগণকে সাহায্য দান ও বিবিধ ব্রত-পার্ব্বণের উদ্‌যাপনার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের সাধনায় নিরতা রইতেন। কুমারীজীবনে পিতৃগৃহে তাঁরা যে শিক্ষা লাভ করতেন, পরবর্ত্তী বিবাহিত জীবনে তাঁরা সে শিক্ষাকেই আমৃত্যু অনুসরণ ক'রে চলতেন। বস্তুতঃ গৃহের নৈতিক ও ধর্ম্মীয় পরিবেশকে তাঁরাই নিত্য নিত্য ব্রত-পার্ব্বণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টিত থাকতেন এবং তার প্রভাব নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই প্রায় সমভাবে আপতিত হতো।

শুধু নারীর উপর নয়, ব্রতোৎসবের প্রভাব পুরুষদের ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও প্রযোজ্য

আমাদের গৃহে, মন্দিরে বা সাধারণ দেবস্থানে নানা উদ্দেশ্যে নানা তিথি ও বারে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সকল ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানই যে নারীদের একক অধিকারভুক্ত তা নয়, বহু ব্রত, পূজা ও উৎসব-পার্ব্বণ আছে, যা পুরুষ এবং নারী উভয়েই যুক্তভাবে পালন করেন। যখনি কোনও ধর্মীয় উৎসব আরম্ভ হয়, তখনই কি বালক, কি বালিকা, কি কিশোর, কি কিশোরী, কি যুবক, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়, কি প্রৌঢ়া, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা সকলের ভিতরেই আনন্দ, উৎসাহ ও ভাব-ভক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যেও এক ধর্মীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। যে সকল ব্রত-পার্ব্বণ শুধু কুমারী বা সধবা বা বিধবা নারীরাই একক ভাবে উদ্‌যাপন করে থাকেন, সে সকল ব্রত-পার্ব্বণের উদ্যোগপর্ব্ব বা অনুষ্ঠানপর্ব্ব উভয়তঃই দেখা যায়, পুরুষদের সমর্থন, শ্রম ও সহযোগিতা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন হচ্ছে। ব্রতিনীদের পূজার বেদীতে শুধু তাঁরাই নন, পুরুষেরাও নতি স্বীকার ক'রে থাকেন। আর প্রসাদ প্রাপ্তির বেলায় তো সকলেরই সমান উৎসাহ। এ সকল বিচারে বলতে চাই—যে-কোনও ব্রতোৎসব বা পূজা-পার্ব্বণই হোক তা কি প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে নারীদের ন্যায় পুরুষদেরও আত্মবিকাশের সহায়ক। বর্ত্তমান যুগে পুরুষদের জন্য গুরুকুল-শিক্ষাপ্রথা আর নেই। সে অগ্নিহোত্রের পবিত্র অনল নির্ব্বাপিত, সে ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনার সুযোগ অন্তর্হিত, সে গুরুসেবা নেই, বেদাধ্যয়নও নেই, এমন কি আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নৈতিক ও ধার্মিক জীবনের উপাদেয় আদর্শনিচয় পর্যন্ত একরূপ বিবর্জ্জিত। পুরুষদের নৈতিক ও ধার্ম্মিক জীবন গঠনের পথে এক নূতন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তথাপি ভরসা—হিন্দুর ঘরে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ এখনো একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, কুমারীরা অদ্যাপি

নানা ব্রতের আচরণ ক'রে থাকে, সধবা ও বিধবা রমণীরাও ব্রতাচরণ বিস্মৃত হন নি, তা ছাড়া সার্ব্বজনিক পূজোৎসবের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত। ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত জীবন গঠনের সুবিধা একেবারে আমরা হারিয়ে ফেলি নি।

এক্ষণে মূল আলোচ্য বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করি। কুমারী-ব্রতরহস্য আলোচনাই এ অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ প্রসঙ্গে ব্রতপার্ব্বণের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মবিকাশের শিক্ষার অপরূপ ভঙ্গিটিও আমরা লক্ষ্য করবো।

কুমারীব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস

বাহ্য আবরণে সমাবৃত একটি ক্ষুদ্র কমলকলি। আমরা জানি নে, প্রকৃতির সস্নেহ পরিচর্য্যায় তার ভিতরে কতগুলি দল আত্মপ্রকাশের উল্লাসে ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, পৃথিবীতে বিতরণের জন্য কত মধু, কত সৌরভ সে সঞ্চয় ক'রে চলেছে, এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র বর্ণবিভূতি তার প্রতিটি দলে প্রতি ক্ষণে অনুরঞ্জিত হচ্ছে। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য,—উপযুক্ত আনুকূল্য পেলে ফুলটি একদিন ফুটবেই। তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ অবদান নিয়ে সরোবর আলো ক'রে যখন বিরাজ করবে, তখন তার পরিচয় আর গোপনীয় থাকবে না। মানুষের শৈশব জীবনও এমনি এক অনাঘ্রাত, অস্ফুট কুসুমকলিতুল্য। তার ভিতরে কোন্ মানুষটি আত্মপ্রকাশের বিপুল প্রস্তুতি নিচ্ছে তা আমরা জানি নে। আপন অন্তঃপ্রকৃতির মহিমাতেই সে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং একদিন তার পূর্ণ বিকাশ হবে। পরিবেশ যদি মহত্তর হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা আশা করতে পারি, অদূর ভাবীকালে তার জীবনমুকুলের যে বাস্তব প্রকাশ আমরা দেখ্‌বো তা হবে কমলকুসুমের ন্যায়ই সুন্দর ও সুরভিমণ্ডিত, সে মহাজীবন আপন শতদলে বিস্তার লাভ ক'রে স্বকীয় মধু ক্ষরণে একদা দেশ ও সমাজকে পরিতৃপ্ত করবে। সুতরাং, একটা মহাজীবনের জন্মদানে নিত্যা অন্তঃপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রয়াস যেমন সত্য, তেমনি বহিঃপ্রকৃতির আন্তরিক ও নিরবচ্ছিন্ন অবদানও কম সত্য নহে। জন্মগত প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি থাকে কোনও দৈন্য, তবে পারিবারিক ও সামাজিক অনুকূল পারিপার্শ্বিক সে দৈন্য অপসারণ ক'রে সেই জীবনটিকে নূতন ভঙ্গিতে গড়ে তুল্‌তে সাহায্য করতে পারে। ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিরা একথা অবগত ছিলেন। উপযুক্ত পরিবেশে যথার্থ মানুষ তৈরীর বিজ্ঞানসম্মত উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন।

আমাদের জানা আছে, পুরুষেরা যথাকালে গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতো। মেয়েদের সে সুবিধা ছিল না। তারা পিতৃগৃহে থেকে আশৈশব ব্রতাদি আচরণ ক'রে যা কিছু সুন্দর ও শুভ তা আহরণপূর্ব্বক জীবনপাত্রটি

ভরে তুলবার সাধনায় রত হতো। পরিপূর্ণ মহত্তর জীবনের এক অনবদ্য আলেখ্য তাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা হ'য়েছে এবং সে চেষ্টাই পরিণত ও সফল রূপ পেয়েছে কুমারীব্রতের মধ্য দিয়ে। আমাদের মতে—এই হলো কুমারীব্রতের উৎপত্তির আসল ইতিহাস। নানা যুগবিবর্ত্তনে তার রূপের নানা পরিবর্ত্তন হয়তো হয়েছে। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস—এ পরিবর্ত্তনও ঘটেছে এক শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মীয় নীতির সমাশ্রয়েই।

কুমারীব্রতের প্রকৃতি

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ফুলটি গাছে ফোটে তার নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রেই, জবরদস্তির দ্বারা একটা ফুল কেউ ফোটাতে পারে না। তবে বাইরের পরিচর্য্যায় তাকে সাহায্য করা যায় মাত্র। যদি উপযুক্ত সার ও জলসেচ পায়, যদি বাইরের আবহাওয়া অনুকূল ও সুখকর হয়, যদি তার উপর ক্ষতিকর কীটাদির উপদ্রব না ঘটে, তবে গাছটিও বাড়বে, ফুলটিও ফুটবে। অতএব, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হচেছ তাকে সাহায্য করা, তার উপর বলপ্রয়োগ করা নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়—কুমারীব্রতকল্পের স্বাভাবিক প্রকৃতি কি, তবে উপরোক্ত দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আমরা উত্তর দিব, "জবরদস্তি নয়, প্রীতিকর ও আনন্দজনক সহযোগিতা"—এই নীতির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখেই এর প্রকৃতি নির্দ্ধারিত। যদিও সকল বয়সের সকল স্তরের সকল ধর্ম্মীয় সাধনার ক্ষেত্রেই এই নীতি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, তথাপি কুমারীদের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে। আলোচনা কালে দেখতে পাবো, এক সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আধারের উপর সমগ্র কুমারীব্রতকল্প বিধৃত। মনে হয় ব্রতের প্রবর্ত্তক মনীষীরা কুমারীদের বালসুলভ প্রবণতাগুলি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন এবং সে প্রবণতার ছাঁচেই গড়ে তুলেছিলেন বিচিত্র ব্রতকল্প। ব্রতের মাধ্যমে ভাবী মহত্তর জীবনের সত্য উপলব্ধিনিচয় পরিবেশন করা হয়েছে, কিন্তু অতি সুকৌশলে। উন্নত জীবনের সৎ নীতিগুলিকে শরতের শিউলি ফুলের মত যেন ছড়িয়ে দেওয়া হলো, কুমারীরা তা পছন্দ মত বা ইচ্ছা মত কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের সাজি ভর্ত্তি করবে। আমরা যদি আমাদের পরিণত বুদ্ধি ও মানদণ্ডে ওদের চরিত্রকে বিচার ক'রে আমাদেরই মতলব অনুযায়ী রাশি রাশি ফুলের বোঝা ওদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে যাই, তবে সেই বস্তাভর্ত্তি কুসুমের গুরু ভারে ওরা হয়তো একবারে ন্যুব্জ হয়েই পড়বে। ব্রতকল্পের আসল উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ।

কুমারীদের শৈশব প্রবণতা কি?

কুমারীদের ভিতরে দু'টি প্রবণতা খুব প্রবল। এক—ছড়া আবৃত্তি, দুই —পুতুল খেলা। ছড়ার মধ্যে আছে ছন্দ, খেলায় আছে আনন্দ। শুধু কুমারী

নয়, এই ছন্দ এবং আনন্দ প্রতিটি শিশুমনেরই সহজাত বৃত্তি। তুমি কি শিশুর মনকে জয় ক'রে নিজের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করতে চাও? তবে জেনে রাখ—ওর মনোরাজ্যে অন্তঃপ্রবেশের ঐ হলো সিংহদ্বার। তাকে শুনাও ছন্দ, তাকে দাও আনন্দ। এই বশীকরণ মন্ত্রেই তাকে নিকটতর করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—একটি দুরন্ত বা ক্রন্দনরত শিশুকে "ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসীর" ছড়া গেয়ে সহজেই নিদ্রাপুরীতে পাঠানো যায়, অথবা একটা রঙ্গিন্ খেলনা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করা যায়। আর একটু বয়স হ'লেই দেখবে, সে হয় তো দলবল নিয়ে "ইকিড় মিকিড় চামচিকিড়" ছড়া আবৃত্তি ক'রে তোমার নীরব ঘরখানি মাতিয়ে তুলেছে, না হয় একরাশ পুতুল নিয়ে বিরাট খেলা জুড়ে দিয়েছে। আরো লক্ষ্য করবে—সেই পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে তার ভাবী জীবনের অভীপ্সাগুলি যেন অস্ফুট মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। তোমার মতই সে তোমারই নিভৃত গৃহকোণে পেতেছে ছোট্ট এক নূতন সংসার। সেখানে তার পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে, কন্যা আছে, জামাতা আছে, আছে সেখানে ঘরবাঁধা, আছে সেখানে রান্নাবান্না, আছে সেখানে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অতিথি আপ্যায়ন, আছে সেখানে সন্তান-পালন, স্তন্যদান, আছে সেখানে সেবা ও স্নেহবাৎসল্যের সুনিপুণ অনুকৃতি। সে ছড়ার মধ্য দিয়ে মহিমময় জীবনের মূলগত ছন্দটিকে আবিষ্কার করতে চায়, আর খেলার মধ্য দিয়ে চায় জীবনের ভাবী শুভ কর্ত্তব্যগুলিকে অনুভব করতে। এ কথা অবশ্যই সত্য—তার মনের অবচেতন স্তরের এ রহস্য সে নিজেই জানে না। তার নিজের অজ্ঞাতসারেই এসব হয়। কিন্তু, তার এ খেলাকে যদি তুমি উদ্দেশ্যহীন ও ছন্দোহীন মনে কর, তবে মস্ত ভুল করা হবে। শিশুমনের এই সহজাত বৃত্তিকে মহত্তর জীবন গঠনের কাজে লাগানো যায়। কুমরীব্রতকল্পের ভিতর দিয়ে তা-ই করা হয়েছে। বস্তুতঃ কুমারীব্রতকল্পকে এক শ্রেণীর কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) স্বরূপ বলা যায়। তবে আমরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, এগুলির আসল উদ্দেশ্য চারিত্র্য নীতি শিক্ষাদান—আক্ষরিক শিক্ষা নহে। আরো লক্ষ্য করবে—এজন্য বড় বড় ইন্‌ষ্টিটিউশন গড়তে হয়নি—গৃহস্থের নিজ গৃহই ছিল এর উপযুক্ত শিক্ষাগার। চিত্তাকর্ষক খেলার ছলে শিশুগণকে আনন্দ ও শিক্ষাদান ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল মনে হয়। আমরা অনেকেই হয়তো চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার কথা শুনে থাকবো। ভাগবতের "ভাবার্থদীপিকা" নামক টীকায় প্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামী চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার যে তালিকা দিয়েছেন, তন্মধ্যে "বালকক্রীড়নকানি" অন্যতম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী মুনির গৃহে অন্যান্য তেষট্টিটি বিদ্যার সঙ্গে এটিও শিক্ষা করেছিলেন। এতেই মনে হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ স্থান ছিল। খেলা ও খেলনার সাহায্যে শিশুদের মনোরঞ্জনের নানা কৌশল ও পরিকল্পনা উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হতো এবং তার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হতো বুদ্ধিবিকাশের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাথমিক নীতিশিক্ষা—এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। অন্ততঃ কুমারীব্রতের লোকায়ত অনুষ্ঠানগুলি এই বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দান করে।

দশ পুতুলির ব্রত, পুণ্যিপুকুরব্রত, যমপুকুরব্রত, পৃথিবীব্রত, শিবব্রত, হরির চরণব্রত প্রভৃতি অসংখ্য ব্রতানুষ্ঠানের রহস্যালোচনায় সে সত্যটিই বড় হ'য়ে দেখা দিবে।

কুমারীব্রতগুলি আরম্ভ হয় সাধারণতঃ বালিকাদের পাঁচ বৎসর বয়সে।

দশপুতুলীর ব্রত

এবার আলোচনার মূল ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক। প্রথমে দশপুতুলীর ব্রতের কথা। "পুতুল" শব্দ দিয়েই ব্রতের নামকরণ। কুমারীরা ভালবাসে ব'লে কত ভাল ভাল খেলনা আমরা তাদিগকে কিনে দিই। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পাঁচটা উজ্জ্বল স্বপ্ন কি ওদের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। এ কাজ যে অসম্ভব বা অবাস্তব নয়, দশপুতুলীর ব্রতই তার সাক্ষ্য দান করে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ হয়ে বৈশাখ সংক্রান্তিতে এ ব্রত পরিসমাপ্ত হয়। প্রত্যহ পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল গড়ে দশটি বিশেষ মন্ত্রে ফুলদূর্ব্বাদি সহায়ে তাদের পূজো করতে হয়—এই হলো সংক্ষেপে দশপুতুলীর ব্রত। কুমারীদের পুতুল গড়া ও পুতুল খেলার শিশুসংস্কারসুলভ অভিপ্রায় মাসব্যাপী ব্রতানুষ্ঠান কালেই তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু, এ খেলার মধ্য দিয়েই দশটি জীবনমন্ত্র তাদের বালকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠে। যথাঃ—

১। এবার ম'রে মানুষ হব। রামের মত পতি পাব ॥
২। এবার ম'রে মানুষ হব। সীতার মত সতী হব ॥
৩। এবার ম'রে মানুষ হব। লক্ষ্মণের মত দেবর পাব ॥
৪। এবার ম'রে মানুষ হব। দশরথের মত শ্বশুর পাব ॥
৫। এবার ম'রে মানুষ হব। কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব ॥
৬। এবার ম'রে মানুষ হব। কুন্তীর মত পুত্রবতী হব ॥
৭। এবার ম'রে মানুষ হব। দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব ॥
৮। এবার ম'রে মানুষ হব। দুর্গার মত সোহাগী হব ॥

৯। এবার ম'রে মানুষ হব। পৃথিবীর মত ভার সব ॥
১০। এবার ম'রে মানুষ হব। ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব ॥

দশটি পুতুল যেন দশটি মহৎ জীবনের স্থূল মূর্তি। মহৎ জীবনের পূজার মন্ত্রেই জীবন মহৎ হয়। একটি প্রদীপের দীপশিখার সংস্পর্শে যেমন সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করা যায়, তেমনি এক একটি মহাজীবনের অনুধ্যানে লক্ষ লক্ষ মহাজীবনের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে। দশপুতুলীর ব্রতে সীতা, কুন্তী, দ্রৌপদী, দুর্গা, ষষ্ঠী, পৃথিবী প্রভৃতির আদর্শ চরিত্রের প্রতি কুমারীদিগকে জিজ্ঞাসু ও আগ্রহী ক'রে তোলা হচ্ছে—নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিগুলির সঙ্গেও তারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করছে। জীবনের এ স্বপ্নকে তারা সফল করবেই। এ জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে সে ব্রত যদি উদ্‌যাপিত নাও হয়, তবে মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবনে নিশ্চয়ই তারা সিদ্ধিবিমণ্ডিত হবে—এ আত্মপ্রত্যয়ই যেন দশপুতুলী-ব্রতের মন্ত্রে দৃপ্ত হয়ে উঠে।

শিবব্রত

শিবব্রত—কুমারীদের অতি প্রিয় অনুষ্ঠান। হিমালয়নন্দিনী পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। কুমারীজীবনের সেই তপস্যার ঐতিহ্য যুগযুগ ধ'রে জীবিত রয়েছে। বিবাহ কোনও যৌন মিলন নয়—তা আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। দু'টি আত্মাই বিশুদ্ধ হ'লে তবে এ মিলন সার্থক ও সুখের হয়। আজিকার কুমারীরাই আগামীকল্য বধূরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের তপস্যার সুকৃতিই নিয়ে আসবে এই নূতন সার্থক জীবন।

শিবব্রতের নিয়ম এই। সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী প্রতিদিন একটি ক'রে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শিবলিঙ্গ মৃত্তিকার দ্বারা গড়তে হয়। অন্যান্য বিধানের যথাযথ অনুসরণের সহিত তিন বার মন্ত্রোচ্চারণের সহিত শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে হয়।

জলঢালার মন্ত্র ঃ—

শিল শিলাটন শিলে বাটন শিল অঝ্‌ঝরে ঝরে।
স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব—গৌরী কি ব্রত করে ॥
নড়ে আশ নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে ক'রে গৌরী আরাধন ॥

অঞ্জলিদানের মন্ত্র ঃ—

কালা পুষ্প তুল্‌তে গেলাম সেখানে অনেক লতাপাতা।
শিবচরণে দেখা হলো শিবের মাথায় অনেক জটা ॥

আকন্দ, বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল।
তাই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর ॥

মন্ত্র দু'টি কেমন ? "ইকিড়-মিকিড় চাম-চিকিড়" এর মতই প্রায় অর্থহীন নয় কি ? "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" আদি কঠিন সংস্কৃত মন্ত্রের এখানে অনুপস্থিতি। ভাল বাংলা কবিতাও নেই। শিশুদের অভ্যস্ত ছড়ার ছন্দে পূজার মন্ত্র রচিত। কিন্তু, মন্ত্র দু'টির এক সহজ আবেদন রয়েছে, তা হলো শিবভক্তি। মৃত্তিকা দিয়ে মূর্ত্তি গড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে এখানেও। কুমারীদের পুতুল গড়ার সাধ দেবমূর্ত্তি গঠনের পুণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। দেবতা গড়তে শিখলে নিজেও দেবতা হওয়া যায় বৈ কি !

পুণ্যিপুকুর ব্রত

বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায়—এ ব্রত অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের এক প্রকার পুকুর-পুকুর খেলা। কিন্তু, এ খেলায় আছে পুণ্যলাভের উদগ্র কামনা। তাই পুকুরখেলা শেষ পর্য্যন্ত পুকুরব্রতে পরিণত হয়েছে। ব্রতের নিয়ম এই। গৃহপ্রাঙ্গণে এক হাত চৌকো এক পুকুর কাটতে হয়। পুকুরে থাক্‌বে জল। চারিদিকে চারিটি ঘাট, মধ্যখানে একটি তুলসী বৃক্ষ। তুলসীর মাথায় জল ঢেলে বলা হয় ঃ—

তুলসী তুলসী নারায়ণ,
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার মাথায় ঢালি জল,
অন্তিম কালে দিও স্থল ॥

পুণ্যি পুকুরে জল ঢেলে বলা হয় ঃ—

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী ॥
পূজি চন্দন দূর্ব্বাফুলে,
বাড়ুক লক্ষ্মী বাপের কুলে।
পুণ্যিপুকুর ঢালি জল,
বাপভায়ের হোক অশেষ মঙ্গল ॥

ফুলচন্দন ও দূর্ব্বার অর্ঘ্য দানের মন্ত্র ঃ—

এ পূজলে কি হয় ?
নির্ধনীর ধন হয়।

সাবিত্রীর সমান হয়।
স্বামীর আদরিণী হয়।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে।
মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে ॥

এ ছড়াগুলির বাঁধুনী ভাল। ইহ জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং অন্তিমে পরা গতি—ধর্ম্মসাধনার এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই বালিকাদের কচি কচি কণ্ঠে ছড়ার সুললিত ছন্দে গীত হয়, আমরা লক্ষ্য করি। পুণ্যি পুকুরের পূজার মধ্য দিয়ে শিশুকাল থেকেই কুমারীদের চিত্তে পুণ্য ভাবনাগুলির উন্মেষ ঘটে।

হরির চরণব্রত

পুণ্যিপুকুর ব্রতে তুলসীকে পূজা করা হয়েছে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে। কিন্তু, তাতে আশা মিটেনি। ভক্ত চায় ভগবানের চরণ দু'খানির প্রত্যক্ষ পুণ্যস্পর্শ। ঐ অভয় চরণই তো জীবনের পরম লক্ষ্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পুতুল খেলা যেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনি বার্দ্ধক্যের শেষ স্তরে মানুষের সংসারখেলারও অবসান ঘটবে। তখন ঐ রাতুল চরণই তো জীবের একমাত্র ভরসা। সুতরাং, খেলায় ভুলে আসল বস্তুকে হারালে চলবে কেন? শিশুকাল থেকেই এ আত্মদৃষ্টি যদি উদগ্র থাকে, তবে জীবনে কখনা পতন ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

হরির চরণব্রতে তাম্র টাটে শ্বেত চন্দন দিয়ে দু'টি পদচিহ্ন (হরির চরণ) অঙ্কিত করতে হয়। অতঃপর এক লম্বা ছড়া আবৃত্তি ক'রে চলে তাঁর পূজন ও আরাধন। শ্রীহরির চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক ভবিষ্য আদর্শ গৃহিণীজীবনে যা প্রয়োজন সেগুলি চাওয়া হয়। যথা ঃ—

হরির চরণ হরির পা
হরি বলেন—ওগো মা,
আজ কেন গো শীতল পা?
কোন্ যুবতী পূজে পা?
সে যুবতী কি চায়?

উত্তরে বলা হয় ঃ—

"রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়। সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়। প্রেমানন্দ ভাই চায়। ঘরগৃহিণী বউ চায়। রূপবতী কন্যা চায়। দরবার-জোড়া ব্যাটা চায়।"

আদর্শ পতি, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ কন্যা, আদর্শ জামাতা, আদর্শ পুত্রবধূ—এ নিয়েই গৃহের সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা-সমৃদ্ধি। সুতরাং, এ চাওয়া খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুগৃহিণীর ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম, তিতিক্ষা ও

ঔদার্য্যের প্রভাবেই কিন্তু সংসারে আদর্শ মানবতা জন্মলাভ করে। কুমারী বয়স থেকেই যদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে তারা সুগৃহিণীতে পরিণত হয়ে সংসার আলো করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

সংসারে মানুষ চাই ঠিকই। কিন্তু শুধু মানুষের দ্বারাই কি সকল অভাবের মোচন হয় ? তা হয় না। সংসারের সুখের জন্য ধন-দৌলত, আসবাব-পত্র অনেক কিছুই দরকার, সর্ব্বোপরি চাই শুচিতা ও সদাচার। কুমারীদের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয় :—

আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্‌ করে।
ঘরের বাসন ঝক্‌ঝক্‌ করে ॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান।
বছর বছর পুত্র পান।।

সরল অনাড়ম্বর অথচ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের এক চিত্র ফুটে উঠেছে এই মন্ত্রের ভিতরে। পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কথাও বলা হয়েছে। গোপালন ও কৃষির প্রশ্নও উঠেছে।

হরির চরণে শেষ প্রার্থনা :—

না দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ।
না দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ ॥
হবে পুত্র মরবে না।
চক্ষের জল পড়বে না ॥
দিয়ে পুত্র স্বামীর কোলে।
মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে ॥

পতিব্রতা স্ত্রী এবং বাৎসল্যময়ী জননীদের প্রাণের এই তো চিরপোষিত ঐকান্তিকী কামনা। মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই তাঁরা সন্তুষ্ট। তার বেশী ঐশ্বর্য্য তাঁরা আশা করেন না। কিন্তু, তাঁরা চান শাঁখা-সিন্দূর নিয়ে শান্তিতে মরতে। পতিশোক, পুত্রশোক, আত্মীয়বিয়োগজনিত শোক তাঁদের অনভিপ্রেত। দৈন্যহীন এবং শোকরহিত জীবনের চেয়ে সুখ আর কোথায় আছে ? বস্তুতঃ সুকৃতিবতীদের জীবনই অদীন ও অশোক হয়। মৃত্যুর পর তাঁদের গঙ্গা-প্রাপ্তি বা সদ্‌গতি যে হবে তা কোনও সন্দেহের বিষয় কি ?

অশ্বত্থপাতা ব্রত

হিন্দুর দৃষ্টিতে বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং এ দু'টি বৃক্ষমূলে জলঢালা অতি পুণ্যজনক। কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বত্থপাতা ব্রতের উদ্দেশ্য—এই ধর্ম্মবৃক্ষ বিশেষের প্রতি সেবা ও ভক্তিভাব জাগানো। কিন্তু, তা ছাড়াও এ ব্রতের আরো কিছু বিশেষত্ব আছে। অবৈধব্য, স্থির রূপযৌবন,

সুসন্তান, সুখ-ঐশ্বর্য্য, ধন-সম্পদ, স্বস্তি-শান্তি, ভগবৎসেবা প্রভৃতি ভাবী কাম্য বস্তুগুলি প্রাপ্তির সঙ্কল্প এ ব্রতেও আছে, কিন্তু তা যেন অশ্বত্থপাতা সহ এক ক্রীড়ানন্দের মাধ্যমে। এ ব্রতের প্রধান উপকরণ পাঁচটি অশ্বত্থপাতা—একটি কাঁচা, একটি কচি, একটি পাকা, একটি শুকনো এবং একটি ঝুর্ঝুরে ছেঁড়া। পাঁচটি পাতা মাথায় নিয়ে পুষ্করিণীতে গিয়ে গুণে গুণে পাঁচটি ডুব দিতে হয়। তারপর অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে পরিচর্য্যা ও প্রণাম ক'রে বাড়ী আসতে হয়। ব্রতের সংক্ষিপ্ত মন্ত্র নিম্নরূপ ঃ—

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিন্দূর পড়ে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে
কাঞ্চনমূর্ত্তি হয়।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে
নব কুমার কোলে হয়।
শুক্‌নো পাতা মাথায় দিলে
সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।
ঝুর্‌ঝুরে পাতাটি মাথায় দিলে
হীরে মুক্তোর ঝুরি পায়।
উজাইতে পারিলে ইন্দ্রের শচী হয়।
না পারিলে ভগবানের দাসী হয়।
সুখ হয়, সম্পদ হয়, স্বস্তি হয়।
সাত ভাই এর বোন্ হয়।

পাঁচটি অশ্বত্থ পাতার এ হেন অলৌকিক যাদু সত্য সত্যই আছে কি না, সংশয়বাদীরা সে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু, এ ব্রতের যে এক গভীর নৈতিক মূল্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? নিজেদের ভাবী জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার সম্বন্ধে যে সুতীব্র আত্মপ্রত্যয়ের বীজ ওদের কোমল অন্তঃকরণে উপ্ত হয়, তা কোনও বিতর্কের বস্তু ব'লে মনে হয় না।

গোকল ব্রত

হরির চরণব্রতের অন্যতম কামনা ছিল—"গোয়ালে গরু মরায়ে ধান।" গো-সম্পৎ গৃহস্থের সংসার ও জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। সংসারের ভাবী গৃহিণীদিগকে তাই গো-পরিচর্য্যার শিক্ষায় অভ্যস্ত ক'রে তোলা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে গো-সেবায় যেন ওদের মধ্যে কোনও দ্বিধা, ঘৃণা, শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য না আসে। তাই সমাজের উপরের স্তরে গোপাষ্টমী,

গোশালা পূজা প্রভৃতি গো-সম্বর্দ্ধনামূলক ব্রতাদি যেমন আছে, কুমারীদের মধ্যেও তেমনি প্রচলিত আছে গোকল ব্রত। গোমুখে এক আঁটি ঘাস ও একটি আস্ত কলা দিয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। এ ব্রতের ক্রম এইরূপ। গোমুখে আহার্য্য দেবার পূর্ব্বে তার শৃঙ্গে তৈল মাখিয়ে দিয়ে মাথায় জল ঢেলে স্নান করাতে হয়, কপালে হলুদ, সিন্দূর ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে চিরুণীর সাহায্যে তার মাথা আঁচড়ে দিতে হয়, এমন কি আর্শীতে মুখ দেখানোর অনুষ্ঠানটিও বাদ যায় না। গাভীর চারটি পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে তাকে প্রণাম করতে হয়। কিছু মন্ত্রতন্ত্রও আছে। যেমন—

গোকল গোকুলে বাস,
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।

অতঃপর গাভীকে ব্যজন করতে করতে তার নিরাময় ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা ক'রে নিজের জীবনের সমৃদ্ধির কথাও স্মরণ করে বলা হয়ঃ—

রোগ শোক দূর হোক।
কীট পতঙ্গ দূর হোক।
মশা মাছি দূর হোক ॥
তোমাকে ঘুরায়ে পাখা।
আমার হোক সোনার শাঁখা।
তোমাকে বাতাস করি।
সতীন মেরে ঘর করি ॥

গোকলব্রতের সার কথা—গো-পরিচর্য্যায় কুমারীদের হাতেখড়ি দেওয়ানো।

পৃথিবী-ব্রত

দশপুতুলীর ব্রতে কুমারীদের কণ্ঠে জীবনবেদের এক অনবদ্য ঋক্ শ্রবণ করেছি—"পৃথিবীর মত ভার সব।" এর চেয়ে মহতী প্রতিজ্ঞা বুঝি আর কিছুই হতে পারে না। সত্যিই নারীই সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। ধৈর্য্য এবং ক্ষমাগুণেই সে এত বড়। এ দু'টি গুণ যদি নারীর মধ্যে না থাকে তবে সংসার চুরমার হয়ে যায়। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যশীলা ও ক্ষমাময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আদর্শ নারীকে আবির্ভূতা হতে হবে। সে শিক্ষাই তার চারিত্রিক শিক্ষার মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। হিন্দুর সংসারে যে তা-ই হয়েছে, পৃথিবীব্রত তার অন্যতম নিদর্শন।

পৃথিবীব্রতে কোনও পুতুল-টুতুল নেই, আছে ছবি। পিটুলি গোলা দিয়ে ভূমিতে পদ্মপত্র আঁকতে হয়, তার উপরে আঁকা হয় পৃথিবী। ঐ আলপনায়

ঘৃত, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি ঢেলে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত মন্ত্রে ব্রত উদ্‌যাপনা করতে হয় ঃ—

এসো ধরিত্রী বসো পদ্মপাতে।
শঙ্খচক্র ধরি হাতে॥
খাওয়াব ক্ষীর মাখাবো ননী।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥

পৃথিবীব্রতের চমৎকার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কেবল ধৈর্য্য ও ক্ষমার আদর্শের চরিত্রানুকূল প্রকাশ-বিকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ভিতর দিয়ে আরো একটা মহৎ কাজ সাধিত হতে পারে। এ ব্রতের আচরণ কালে কচি কচি বালিকাদের মনে স্বভাবতঃই সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল জেগে উঠা বিচিত্র নয় এবং আমাদের ধারণা তা জেগেও থাকে। সমগ্র বিশ্বকে জানবার, বুঝবার যে আগ্রহ বা আকুতি, তা মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মিক সম্বন্ধটি উপলব্ধি করতেও প্রচুর সহায়তা করে, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার মহাপাপ দূরীভূত হয়ে চিত্তের ঔদার্য্য এতে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চরিত্র গঠনের এ এক মস্ত বড় দিক।

যমপুকুর ব্রত

পৌরাণিক যমপুষ্করিণীব্রত প্রসিদ্ধ। সে বিষয়ে পরে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এটুকুই ব'লে রাখি—গ্রাম্য ছড়া আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যমপুকুর ব্রত ঐ পৌরাণিক ব্রতেরই এক সহজ অনুকৃতি। কুমারীদের পুণ্যি পুকুর ব্রতের চেয়েও এ ব্রতে পুতুল খেলার সুযোগ অনেক অধিক। ঘরের উঠুনে এক হাত চৌকো পুকুর কেটে তাতে চারিদিকে চারটি ঘাট এবং মধ্য খানে কচু, হলুদ, কলমী, সুষনী ও হিংচে গাছের চারা বসিয়ে দিতে হয়। পুকুরের চারিদিকে থাকবে অসংখ্য পুতুল। যমরাজা ও যমরাণী তো থাক্‌বেনই, যমের মাসী-পিসীও থাকবেন, ধোপা-ধোপানী, শেকো-শেকোনী, মেছো-মেছোনী, কাক, বক, চিল, কুমীর, কচ্ছপ, হাঙ্গর—এ সবও থাকবে। ঐ ছোট্ট পুকুরটির পাড়ে বসে ফুল দিয়ে সব পুতুলগুলির পূজা করতে হয়—এ পূজায় সাক্ষী রাখা হয় যমরাজা, যমরাণী আর যমের মাসীকে।

পুকুরে জল ঢেলে বলা হয় ঃ—

সুষনী কলমী লল করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারেন পক্ষী শুকোয় বিল।

সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগলো ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর ॥

মন্ত্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড ধাঁধার মত মনে হয়। এর ভিতরে কোনও বিশেষ সঙ্কেত আছে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। "রাজার বেটা পক্ষী মারে"—এ কথার মধ্যে যমরাজের সংহারধর্ম্মের বর্ণনা থাকা বিচিত্র নয়। কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুপূর্ণ যমপুষ্করিণী কি দুষ্পাড় বৈতরণীর প্রতীক্? কেমনে এ বিশাল জলধি উত্তীর্ণ হওয়া যাবে? যম জীবসংহার করেন তাঁর বিভীষণ মূর্তিতে, কিন্তু তাঁর করুণা হলে জীব অনায়াসে মুক্তিও পেতে পারে—এ উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভয়ালমূর্ত্তি বৈতরণী তখন শুকিয়ে যাবে। "মারেন পক্ষী শুকোয় বিল"—এ কথার ভিতর এরূপ কোনও ইঙ্গিত থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। কেন না, পুণ্য অর্জ্জন এবং মুক্তি—এ দুই উদ্দেশ্যই যমপুকুর ব্রতে মুখ্য। অবশ্য ব্রতের মন্ত্রে পিতৃকুলের ধনসমৃদ্ধির কামনাও আছে।

যমপুকুর ব্রতে একটি উপাখ্যান আছে। তাকে উপকথা বলাও চলে। গল্প বা উপকথার প্রতিও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আকর্ষণ কম নয়। উপাখ্যানের সার মর্ম্ম এই: কোনও ভাগ্যবতী কুমারী যমরাজকে পেয়েছিল পতিরূপে। কিন্তু, তার হতভাগিনী মা যমপুকুর ব্রতের ঘোরতর বিরোধী। ফলে মৃত্যুর পর তাকে যমসদনে গিয়ে কৃমিকুণ্ডে চুবুনী খেতে হয়। জামাই বাড়ী গিয়েও বুড়ির দুর্দ্দশার একশেষ। যম ন্যায় বিচারক। সেখানে শাশুড়ী ব'লে কোন ক্ষমা চলে না। কিন্তু, মায়ের জন্য কন্যার প্রাণ তো কাঁদবেই! যমমহিষীর কাতর প্রশ্ন—"মায়ের মুক্তি কিসে?" যমরাজ বলেন—"ভাই এর বাড়ী যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূকে দিয়ে মায়ের কল্যাণে যমপুকুর ব্রত করাও।" যমমহিষী মর্ত্ত্যে গিয়ে আসন্নপ্রসবা ভ্রাতৃবধূকে দিয়ে যমপুকুর ব্রত করিয়ে জননীকে নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে। গল্পটি বুধাষ্টমী ব্রতের হুবহু নকল বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা পরে তা জান্‌বো। যমপুকুর ব্রত সারা আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসব্যাপী করণীয়।

সেঁজুতি ব্রত

যমপুকুর ব্রতে যেমন পুতুলের ছড়াছড়ি, সেঁজুতি ব্রতে তেমনি আলপনার আধিক্য। পিটুলী গোলা দিয়ে অন্ততঃ বাহান্ন রকমের ছবি আঁক্‌তে হয়। তাতে শিবের মূর্ত্তি থেকে আরম্ভ ক'রে দোলা, কোঁড়া, বেগুন পাতা, ঢেঁকি, বঁটি, খ্যাংড়া অনেক কিছুই থাক্‌বে। এ ছবিগুলি এক একটা বিশিষ্ট প্রতীক। এ প্রতীকগুলিকে অবলম্বন ক'রে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের এক

অকপট অভিব্যক্তি ছড়াগানের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠে। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

শিবের চিত্রে দূর্ব্বা ধ'রে বলা হয় ঃ—

হে শঙ্কর দিনকর নাথ,
কখনো না পড়ি মূর্খের হাত।

দোলার চিত্রে—

দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥
বাপের বাড়ীর দোলা খানি
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আস্‌তে যেতে দোলাখানি
ঘৃতমধু খায়॥

বেগুন পাতার চিত্রে বলা হয় ঃ—

বেগুন পাতা ঢলা ঢলা।
মায়ের কোলে সোনার তোলা॥
হেন মা পুত বিওলি।
শুভক্ষণে রাত পোয়ালি॥

গঙ্গা ও যমুনার চিত্রে—

গঙ্গা-যমুনা জোড় হই।
সাত ভায়ের বোন হই।
সাবিত্রীর সমান হই॥
গঙ্গা-যমুনা পূজ্যন্।
সোনার থালে ভোজ্যন্॥
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু॥

বেনা গাছের চিত্রে—

গুয়োগাছ সুপুরী গাছ মুটি ধরে মাজা।
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর, ভাই হয়েছেন রাজা॥

নাটমন্দির চিত্রে—

নাটমন্দির বাংলা জোড়া।
দোরে হাতী বাইরে ঘোড়া॥
দাসদাসী গো-মহিষী গির্দ্দে আশেপাশে।
রূপযৌবন সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে॥

ধাতাকাতার চিত্রে—

ধাতাকাতা বিধাতা তুমি দাও বর।
আমার যেন স্বামী হয় রাজ-রাজ্যেশ্বর ॥

কাজললতার চিত্রে—

কাজল-লতা কাজল-লতা বাসর-ঘর।
দাও মা মেলানি যাই শ্বশুর ঘর ॥

পাখীর চিত্রে—

সোপাখী সোপাখী।
আমি যেন হই জন্মসুখী ॥

কুঁচকুঁচুতীর চিত্রে—

কুঁচকুঁচুতী কুঁচুই বোন।
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ॥
মোহর এলো ছালা ছালা।
তাই তুলতে এত বেলা ॥
ধান চাল টাকা এলো ছালা ছালা।
তাই তুলতে এত বেলা ॥

অন্যান্য চিত্রে দূর্ব্বা ধ'রে যে সকল প্রার্থনা করা হয় তার মধ্যেও "সোনার থালে ভোজ্যন্" আদি সৌভাগ্য লাভের কথাটাই বার বার ক'রে বলা হয়েছে।

সেঁজুতি-ব্রতের কয়েকটি প্রতীকের ছড়ায় বহুবিবাহ-সমর্থক সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের আপত্তি ও বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছে। ভারতে পুরুষদের বহু বিবাহপ্রথা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু, নারীসমাজ কোন কালেই এটাকে প্রীতিকর দৃষ্টিতে দেখেন নি। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনে এটা দুঃখদায়ক হয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের অন্তঃপুরের সীমিত গণ্ডীর ভিতরে চিরবন্দিনী থেকেও এ প্রথার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বিক্ষোভ জানিয়ে আসছেন। এ বিক্ষোভও অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তে সপত্নী-উৎসাদন মন্ত্রে এ বিক্ষোভ আমরা প্রথম ধূমায়িত দেখি। সেঁজুতি ব্রতের কয়েকটি ছড়ার ভিতরে সে ধূমায়িত বিক্ষোভই যেন প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গীরণ ক'রে সমাজের এ অন্যায় বিধিকে দগ্ধ করতে সমুদ্যত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। উদ্‌বেড়ালি, বেড়ি, হাতা, তালগাছ, থুতকুড়ী, ময়না প্রভৃতি চিত্রে দূর্ব্বা ধ'রে বলা হয়ঃ—

উদ্‌বেড়ালী উৎখা। স্বামী রেখে সতীন খা ॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি। সতীন বেটী চেড়ী ॥

হাতা হাতা হাতা। খা সতীনের মাথা ॥
তালগাছেতে বাবুই বাসা। সতীন মরে দেখতে খাসা ॥
থুতকুড়ী থুতকুড়ী। সতীন বেটী আঁটকুড়ী ॥
ময়না ময়না ময়না। সতীন যেন হয় না ॥

ছড়াগুলো পড়ে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে, নারীর উন্নত চরিত্রমাধুর্য্যের সঙ্গে এগুলি যেন সঙ্গতিহীন। এতে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও নগ্ন হিংসাবৃত্তির প্ররোচনাই অধিক। কিন্তু, আমরা তা বলতে চাইনে। কারণ, আমাদের মতে এ বিক্ষোভটা আসলে কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নয়, পরন্তু এক অনর্থকর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে। তবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগ হয়নি, একথা বলাও ঠিক হবে না। যাই হোক, বর্ত্তমান স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে হিন্দুর বহুবিবাহ-প্রথা নিষিদ্ধ। সুতরাং, এ প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদেরও অবসান ঘটুক।

সেঁজুতি ব্রতের কালও কার্ত্তিক মাস। ভগবান্ সূর্য্যের চরণে প্রণতি নিবেদন ক'রে ব্রত সাঙ্গ করা হয়। সূর্য্যপ্রণামের মন্ত্রটি এই—

অরুণ ঠাকুর বরণে।
ফুল ফুটেছে চরণে ॥
যখন ঠাকুর আজ্ঞা পাই।
ফুল কুড়িয়ে ঘরে যাই ॥

আমরা হয়তো লক্ষ্য করেছি, ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্যের সহিত পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী এবং ভাবী পতি, দেবর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনার মন্ত্র অন্যান্য ব্রতের ন্যায় সেঁজুতি ব্রতেও যেন বেদ-ধ্বনির মতই ঝঙ্কৃত। ব্রতের মধ্য দিয়ে ভাবী গৃহিণীদিগকে বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? উত্তর সুস্পষ্ট। নারীজীবনের সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি কেবল তার স্বকীয় স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে নয়, বরং স্বার্থত্যাগে। পরিবারের ভালই তার ভাল, সকলের সমৃদ্ধিই তার সমৃদ্ধি, সকলের সেবায় আত্মসুখের জলাঞ্জলির মধ্যেই তার চূড়ান্ত সুখ, সকলের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের ভিতর দিয়েই সে তার প্রকৃত আত্মসত্তার সন্ধান পায়। আদর্শ হিন্দু নারীর জীবনসাধনার চরম সিদ্ধি এখানেই।

তুষ-তুষলী ব্রত

ধান্য এবং অন্নকে উপলক্ষ্য ক'রে যে সব ব্রত-পূজা প্রচলিত তা পঞ্চম অধ্যায়ে সম্যক্ আলোচিত হবে। এখানে আমরা তুষের ব্রতের পর্য্যায়ে প্রথমে এলাম। সারাটি পৌষ মাস ঘরে ঘরে ঢেঁকির 'ঢক্-ঢকানি' আওয়াজ লেগেই থাকে। নূতন ধান্য থেকে ভিতরের তণ্ডুল নিষ্কাষণ করা হয়।

গাদা-গাদা খোসা বা তুষ পৃথক্ হয়ে পড়ে থাকে। ছেলে মেয়েরা ঐ তুষ নিয়ে কতই না ছড়াছড়ির খেলা শুরু ক'রে দেয়। ঠিক এমনি সময়ে আরম্ভ হয় তুষ-তুষলীর ব্রত। কালো গাই এর গোবরের সঙ্গে নূতন ধান্যের তুষ মিশিয়ে ছ'বুড়ি ছ'টা বর্ত্তুল পিণ্ড তৈরী ক'রে প্রত্যেকটা বর্ত্তুলের মাথায় পাঁচ গাছি ক'রে দূর্ব্বা গুঁজে দিতে হয়। প্রতিদিন চারটি ক'রে বর্ত্তুলের পূজা। পূজা হয় সরষে ফুলে এবং মূলো ফুলে। পৌষ সংক্রান্তিতে এক মাস পূর্ণ হ'লে ব্রতিনী ছ'বুড়ি ছ'টা ক্ষীরের নাড়ু প্রসাদ পায়। একটা মাটীর হাঁড়িতে জমা রাখা তুষ-গোবরের বর্ত্তুলগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রসাদ প্রাপ্তির পর ঐ জ্বলন্ত হাঁড়িটাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসমান পোতের ন্যায় এরূপ একাধিক হাঁড়ি অগ্নিশিখা বুকে বহন ক'রে বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে সারা পুকুরের জলে বিচরণ করতে থাকে। কুমারীদের নিকট সে আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য কতই না রমণীয়!

এ ব্রতের ছড়ার মধ্যেও আছে দরবার-জোড়া বেটা, সভা-উজ্জ্বল জামাই, ধন-সাগুরে মা, অমরগুরু বাপ, সীমন্তের অক্ষয় সিন্দূর ও মরাই ভরা ধানের কামনা। জীবনের উচ্চাশাগুলিকে তুচ্ছ তুষের খেলার মধ্য দিয়ে বাস্তবধর্ম্মী করে তোলা হয়। তুষ-তুষলী কে? মনে হয় নারায়ণ ও লক্ষ্মী। কারণ, ধান্য লক্ষ্মীস্বরূপা। এ ব্রতে ধানের কথাটা জোর দিয়েই বলা হয়েছে। বাণিজ্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। "তুষলী মাই" কে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ব্রতিনীরা বলে—

> তুষলী গেল ভেসে
> আমার বাপ ভাই এলো হেসে ॥
> তুষলী গেল ভেসে।
> আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র এলো হেসে ॥
> তুষলী গেল ভেসে
> ধন দৌলত টাকা কড়ি এলো হেসে ॥

বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্র-শ্বশুর কোত্থেকে এলো? ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি আমদানীর উৎসই বা কি? বাণিজ্য প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে কি? অসম্ভব কিছু নয়। বাণিজ্যোপলক্ষ্যে প্রবাসগত পিতা-ভ্রাতা, স্বামী-পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের অধীর প্রতীক্ষায় বিরহকাতরা মাতা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণীরা একদিন কতই না চিন্তাকুলা হয়ে থাকতেন এবং তাঁদিগকে নিরাপদে গৃহে ফিরে পাবার জন্য নানারূপ ব্রতাদির আচরণ করতেন।

ভাদুলী ব্রত—প্রাচীন বাংলার এমনি এক ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান। ব্রতের ছড়ার মধ্যেই প্রাগুক্ত ইতিহাসের সন্ধানপাওয়া যায়। যথাঃ—

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ ।
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুঃখ ॥
নদী নদী কোথায় যাও ।
সোয়ামী-শ্বশুরের বার্ত্তা দাও ॥
কাগারে বগারে কাল কপালে খাও ।
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে
কোথাও দেখ্‌লা নাও ॥
পুটি পুটি উঠে চা ।
ভাদুলী মায় দিল বর
ঘাটে এলো সপ্ত না ॥
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম ।
বাপ-ভাই এর দর্শন পেলাম ॥

যাক্, আমরা পুনঃ তুষ-তুষলীর ব্রত-বর্ণনায় প্রত্যাবর্ত্তন করছি। বাঁকুড়ার পল্লীতে পল্লীতে এ ব্রতের বহুল প্রচলন দেখেছি। ওরা বলে তুষুর ব্রত। বালিকাদের সমবেত কণ্ঠে বিশিষ্ট সুরে গীত ছড়ার আবৃত্তিগুলি খুবই ভাল লেগেছিল। দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গিয়েও ওরা তুষুর ছড়া গায়। পৌষ-সংক্রান্তিতে তো রাত্রিতে দু'চোখে ঘুম থাকে না। অবিশ্রান্ত ওরা গেয়েই চলেছে। এ গানের মধ্যে তুষ-তুষুলীর মহিমাই শুধু নয়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা, শিবদুর্গার চরিত্রকথা প্রভৃতিও পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। তুষুকে জাগিয়ে বলা হয়ঃ—

উঠ উঠ উঠ তুষু উঠ্ করাতে এসেছি।
তোমার উপর দাসীগুলি পূজিতে সব ডেকেছি ॥
আমরা গোয়ালা জাতি নদীর ধারে বসতি।
সকল দধি খেলেন কৃষ্ণ ঘরে যেয়ে বল্‌ব কি ?
ঘরে যেয়ে বল্‌ব মাকে সকল দধি বেচেছি।

এখানে তুষুর গানে স্পষ্টতঃ যেন ব্রজভাবের অমিয় মাধুরী ফুটে উঠেছে। তুষু নারায়ণ তার সমর্থনও এখানে পাচ্ছি। অন্যত্র দেখতে পাই তুষু শ্রীহরি।

উপরে পাতা নীচে পাতা মাঝ পাতাতে দারোগা।
ও দারোগা পথ ছেড়ে দাও তুষু যাবে কলকাতা ॥
তরল দেখে উঠলাম গাছে তলাতে কে লোক আছে।
তোমরা দু'জন সাক্ষী থাকো ডাল ভেঙ্গে পড়বে পাছে ॥
ডাল ভাঙ্গিলাম ফুল তুলিলাম ফুলের করলাম খঞ্জরী।
এ খঞ্জরী কে বাজাবে তুষু বেটা শ্রীহরি ॥

অন্যত্র তুষুর বিবাহ প্রসঙ্গে গাওয়া হয় ঃ—

বাড়ীর ধারে বেগুন গাছটি বেগুন খেলে বান্দরে।
বাঁদরকে কি দোষ দেব মা ঝাঁপ দিব যে দামোদরে ॥
ও দামোদর ও দামোদর কোন্ ঘাটে সরু বালি।
আমার তুষুর বিয়ে দেবো যার ঘরে সোনার ঝারি।
আটচালা চণ্ডিমেলা বাসর ফুলের বিছানা ॥
পাশ ফিরে শুয়োনা তুষু ভেঙ্গে যাবে গহনা।

শ্বশুর বাড়ীতে তুষু ঃ—

বাড়ীর ভিতর নারকেল গাছটি বারে বারে সাজাবো ॥
একটি নারকেল চুরি গেলে ডাকে চিঠি পাঠাবো ॥
চিঠি পাঠায় পত্র পাঠায় তবু জামাই এলো না।
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই আর রইলো না ॥
আর তিন দিন থাকো জামাই খেতে দিব পাকা পান।
বসতে দেবো সান মঞ্জরী তুষু-মাকে করবো দান ॥

রাম-সীতার বিবাহ-কথা ঃ—

চল্‌লো সব সঙ্গিনীরা রামের বিয়ে দেখিগে।
মিথিলাতে হবে বিয়ে জনক রাজার কন্যাকে।
নামটি সীতা তাই পরীক্ষা হালের মুখে উঠেছে ॥

দক্ষযজ্ঞের কথা ঃ—

দক্ষরাজা যজ্ঞ করেন এলেন মুনি নারায়ণ।
শিবকে হয়নি নিমন্ত্রণ তাই মা দুর্গা বিরস বদন ॥
ওমা দুর্গা ওমা দুর্গা করিস্‌নে মা মনভারি।
শিব না এলে যজ্ঞ সাঙ্গ আমরা কি করতে পারি ॥
শিব যাচ্ছেন ভিক্ষা করতে কাঁধে ঝুলি নটবর।
ভিক্ষা দিতে অঙ্গ কাঁপে, কাঁপে অঙ্গ থর থর ॥

লব-কুশের যুদ্ধ-কাহিনী ঃ—

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া সে ঘোড়া কে ধরেছে।
বালমীকি মুনির আশ্রমেতে লবকুশ ঘোড়া ধরেছে।
বাপ বেটাতে যুদ্ধ ক'রে রামচন্দ্র হেরে গেছে ॥

দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি অনাবশ্যক। এ ব্রতের ছড়ার মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এরূপ নানা বিক্ষিপ্ত পরিচয়ই ব্রতিনীদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, আমরা দেখি।

সন্ধ্যায় প্রদীপ দানব্রত

কার্ত্তিক মাসে কুমারীরা প্রদীপ দানব্রত উদ্‌যাপন করে। এতে নিত্য সান্ধ্যোপাসনায় তাদিগকে অভ্যস্ত ক'রে তোলা হয়। তুলসীতলায় প্রদীপটি জেলে দিয়ে মনোমত যোগ্য পতি লাভের কামনা ব্যক্ত ক'রে তারা বলে ঃ—

কুল কুল কুলে পতি
তিন কুলেতে দিয়ে বাতি।
মাতুল কুল, পিতৃকুল,
শ্বশুর কুল—উজ্জ্বল পতি ॥

তারপর স্বকীয় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বলে ঃ—

প্রদীপেতে দিয়ে ঘি। আমি হব রাজার ঝি ॥
প্রদীপেতে দিয়ে ননী। আমি হব রাজনন্দিনী ॥
প্রদীপেতে দিয়ে মৌ। আমি হব রাজার বৌ ॥
শাঁখ সল্‌তে স্বর্গে বাতি। সন্ধ্যে নাও গো সরস্বতী ॥
যেথায় আছে দেবগণ। সন্ধ্যে নাও গো নারায়ণ ॥

সন্ধ্যাব্রতের মাধ্যমে কুমারীরা বাইরে প্রদীপদানের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি নিজ অন্তরেও জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখাটি জ্বালিয়ে তুল্‌তে চায়, তাই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আহ্বান। হাঁ ঠিকই তো, ভাবী কালে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকদ্যুতির ন্যায়ই সংসারকে ওরা সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করবে। জীবনে এ আলোর প্রথম উন্মেষ হয় মহত্তর সঙ্কল্পের ভিতর দিয়ে। সঙ্কল্পহীন জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে জীবনে কোনও গতি নেই, বিস্তার নেই, সাফল্যও নেই। সন্ধ্যার শুভ পরিবেশে চিত্ত স্থির ও একাগ্র থাকে। সে সময়ে দেবারাধনার ভিতর দিয়ে মন গভীর শ্রদ্ধাযুক্তও হয়। উন্নত জীবনের মহৎ সঙ্কল্পগুলিকে এ সময়েই তো স্মরণ মনন করতে হয়। কুমারীরা তা-ই করে। প্রদীপে ঘৃত, নবনী, মধু আদি ইন্ধন সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উচ্চাভিলাষের সঙ্কল্পনিচয়কেও ঐকান্তিকতার ইন্ধন দিয়ে বাড়িয়ে তোলে। ওরা রাজরাণী হতে চায়। এ উচ্চাশা অযৌক্তিক কিছু নয়। বরং সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যতে আমরা তো আমাদের গৃহ-সংসারের সর্ব্বময়ী সম্রাজ্ঞীরূপেই ওদিগকে পেতে চাই। সেবা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের প্রভাবে ওরা শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননান্দা সকলের চিত্তকে জয়পূর্ব্বক সকলের উপরেই রাণী হয়ে বিরাজ করবে, শ্রুতিরও এই অভিপ্রায়।*

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৬

মকরস্নান ব্রত

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত চলে গেছে। তুষারশীতল শীত ঋতু সমাগত। মাঘ মাসের কন্‌কনে ঠাণ্ডা। কুমারীর দল এক্ষণে মকরস্নান-ব্রতে ব্রতিনী। একটি মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের কিছুটা কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়। তাতে দোষ কিছু নেই। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা ও তামসিকতাই মহাশত্রু। এ রিপুগুলিকে জয় করা প্রয়োজন। এজন্য সংগ্রামী মনোবৃত্তি চাই বৈকি। শিশুকাল, বাল্যকাল বা কৈশোর কাল থেকেই তাই বালক-বালিকাদিগকে কষ্টসহিষ্ণু ক'রে তোলা দরকার। ননীর পুতুল ক'রে তো তা'দিগকে গড়া যায় না!

মকরস্নান ব্রত কুমারী অবস্থা থেকেই যে ধরাতে হবে এমন কোনও ব্যতিক্রমহীন নিয়মের কথা নেই। কৈশোরকাল থেকেও ব্রতারম্ভ করা যায়। সুতরাং, এ ব্রত একটা বোঝা স্বরূপ এরূপ মনে করার কোনও কারণ নেই। কিশোরীরা ছড়া গেয়ে গেয়ে দল বেঁধে এ ব্রত করতে পারে, করেও থাকে। পাঁচটি ডুব দিয়ে পাঁচটি মন্ত্র বলতে হয়। যথা,

এক ডুবিতে আই-ঢাই।
দুই ডুবিতে তারা পাই॥
তিন ডুবিতে মকরের স্নান।
চার ডুবিতে সূর্য্যের স্নান।
পাঁচ ডুবিতে গঙ্গাস্নান॥

কেন এই ব্রতের অনুষ্ঠান? উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, তবু চির নূতন। এক গতিশীল জীবনের অখণ্ড প্রবাহকে অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী ক'রে তুলতে চেয়েছে ব্রতপার্ব্বণগুলি। তাই বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠিত হ'লেও সকল ব্রতের মধ্যেই এক অকৃত্রিম উদ্দেশ্যগত ঐক্য আমরা লক্ষ্য করি। অন্যান্য অনেক ব্রতের ন্যায় মকর-স্নান ব্রতের মধ্যেও অবৈধব্য ও সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্কল্পের ঘোষণাই আমরা দেখি। স্নানান্তে কামনা করা হয়ঃ—

মাঘ মাসেতে কালাপানি।
স্নান করে গো এয়োরাণী॥
এয়ো রাণী হব।
সিঁথেয় সিন্দূর দেবো॥
সাত ভায়ের ভগ্নী হবো।
টানা পাখায় বাতাস খাবো॥
পতির কোলে পুত্র দিয়ে।
ফুল ভাসাবো নদীর কূলে॥

ওরা ভবিষ্যতে যা হবে, ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের মন্ত্রে বার বার সে কথাই শুধু বলে। এতে যেন ওদের কিছু মাত্র অরুচি বা ক্লান্তি নেই।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সধবা-ব্রতকল্পের আলোচনা কালে অনেক কথা আমরা জান্‌বো ও শিখবো। তাই এখানে বেশী কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি জেনে রাখা ভাল যে, প্রতি মঙ্গলবারে মা চণ্ডীর আরাধনা করা হয় ব'লে এ ব্রতের নাম মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। জীবনে শ্রেষ্ঠ মাঙ্গল্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই এ ব্রতের অনুষ্ঠান। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের নানা রূপ আছে। কুমারীরা যে মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের আচরণ করে, তা অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত। দেবীর অপ্রাকৃত মহিমার প্রশস্তিগীতি ব্রতের ছড়ায় এসে ধরা দেয়। যথা ঃ—

সোনার মা ঘট বামনী।
রূপোর মা মঙ্গলচণ্ডী॥
এতক্ষণ গিয়েছিলেন মা
কাহার বাড়ি ?
হাসতে খেলতে তেল সিন্দূর মাখতে
পাটের শাড়ী পরতে সোনার দোলায় দুল্‌তে
হয়েছে এত দেরী।
নির্ধনের ধন দিতে
কাণায় নয়ন দিতে
নিপুত্রের পুত্র দিতে
খোঁড়ায় চল্‌তে দিতে
হয়েছে এত দেরী।

দেবীর করুণাশক্তি অমোঘ। তাঁর শরণাগত হ'লে নির্ধন ধনী হয়, অন্ধ নয়ন পায়, বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে, খঞ্জ চরণযুক্ত হয়। সংসারজীবনে এই মঙ্গলময়ীর আরাধনা তাই একান্তই প্রয়োজন। কুমারীজীবন থেকেই সে আরাধনা শুরু হয় এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তা চলতে থাকে।

মাঘমণ্ডলের ব্রত

এ ব্রত পূর্ব্ববঙ্গে অধিক প্রচলিত। ব্রতটি সুন্দর এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ। মাঘমণ্ডল ব্রত মূলতঃ সূর্য্যের উপাসনা। সূর্য্যোপাসনা বৈদিক কাল থেকেই চলে আসছে। কুমারীব্রতের দীর্ঘ তালিকা থেকেও সূর্য্যের উপাসনা বাদ যায় নি।

প্রতি মাঘ মাসে পাঁচ বৎসর ব্যাপী এই ব্রত করতে হয়। গৃহের আঙ্গিনায় ব্রতমণ্ডল। উপরে সূর্য্য, নীচে অর্দ্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা। এতদুভয়ের মধ্য স্থলে বৃত্তাকার অয়ন-মণ্ডল—প্রথম বৎসরে একটি, দ্বিতীয় বৎসরে দুইটি, তৃতীয় বৎসরে তিনটি, চতুর্থ বৎসরে চারটি এবং পঞ্চম বৎসরে পাঁচটি। ব্রতিনীর ব্রত কয় বৎসর পূর্ণ হলো, তা ঐ অয়ন-চিহ্নের সংখ্যা দেখেই উপলব্ধি করা যায়। এ ব্রতে পিটুলীর আল্পনা নেই, আছে পঞ্চগুঁড়ির বিচিত্র চিত্রাঙ্কন। 'লাউল' বা সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ গড়ে তাকে পুষ্পাদি দ্বারা সুন্দর ভা'বে সাজানো হয়। পূজায় লাগে দূর্ব্বা এবং নানাবিধ বনপুষ্প। খুব ভোরে উঠ্‌তে হয়, পুকুর পাড়ে লাউলের মূর্ত্তি নিয়ে গিয়ে বস্‌তে হয়, তারপর দলবেঁধে সুর করে গাওয়া হয় ব্রতের ছড়া। "উঠ উঠ সূর্য্য ঠাকুর ঝিকি-মিকি দিয়া"—এই মন্ত্রে সূর্য্যোদয়কে স্বাগত জানানো হয়। সর্ব্বজীবে সমদর্শী সূর্য্য। তাঁর আলোকিত করুণা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তিনি উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতি, সুরি, তিলি, মালী সকলকে জাগিয়ে তোলেন, সকলের গৃহই তিনি আলোকিত করেন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে ব্রতী হয়—সমগ্র জগৎ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণবধূ উপবীত, তন্তুবায়বধূ বস্ত্র, কর্ম্মকারবধূ দাত্রাদি, কুম্ভকারবধূ মৃন্ময় পাত্রাদি, তৈলজীবীবধূ তৈল, মাল্যকারবধূ মাল্যাদি সরবরাহে ব্যস্ত হয়। ব্রতের ছড়ার ভিতরে এ দৃশ্যের এক চমৎকার বর্ণনা পরিস্ফুট। সামাজিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের একটা পরিষ্কার ছবি কুমারীদের অন্তরে স্বতঃ জাগ্রত হয়। ব্রতের ছড়ার মধ্যে এ রকম অনেক শিক্ষাই আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চন্দ্রকলার সহিত সূর্য্যের বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গটি। চন্দ্রকলা হলো মাধবের কন্যা। অপূর্ব্ব রূপ-ল্যাবণ্যবতী। কেশদাম সুন্দর ও সুলম্বিত। পরিহিত বস্ত্রখানিও অতি ভব্য। চরণে তার গোল-খাড়ুয়া বা বিচিত্র নূপুর। এ হেন তন্বী বালাকে দেখে সূর্য্য ঠাকুরের মনে ধ'রে গেল। শুধু মনে ধরা নয়, তিনি তার জন্য যেন পাগল।

ব্রতিনীরা গায় ঃ—

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া ছিলেন কেশ।
তারে দেইখ্যা সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ॥
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ী।
তারে দেইখ্যা সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ী বাড়ী॥
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়।
তারে দেইখ্যা সূর্য্য ঠাকুর বিয়া করতে চায়॥

স্বয়ং সূর্য্যদেব যেখানে কন্যাপ্রার্থী, সেখানে মাধবের আপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রতিবেশীদের কৌতূহল—"বিয়া করলেন সূর্য্য ঠাকুর দান পাইলেন কি ?" হিন্দুর বিবাহে দান-সামগ্রী একটা বড় প্রশ্ন। ব্রতের ছড়ায় দানসামগ্রীর এক প্রকাণ্ড তালিকা পেশ করা হয়। তাতে হাতী, ঘোড়া, শয্যা-পালঙ্ক, তৈজস-পত্র সবই আছে। মাধব কে, তা আমরা জানি নে। কন্যার বিবাহে তাঁর দেওয়া যৌতুকসম্ভার লক্ষ্য ক'রে বল্‌তে হয়, তিনি যেমন তেমন ব্যক্তি নহেন। তিনি সত্য সত্যই মা-ধব, অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বা ধনপতি।

বিবাহান্তে চন্দ্রকলার পতিগৃহে যাত্রার সময় উপস্থিত। নারী-জীবনের এ এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। মিলন এবং বিচ্ছেদ, আনন্দ এবং বেদনা উভয়ের সংমিশ্রণে এ মুহূর্ত্তটির এক স্বতন্ত্র আবেদন আছে। এ অবস্থাটি যে কি তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তবে বাহ্যতঃ দেখা যায়, লোকলজ্জা ভয়ে এবং আত্মধৈর্য্য প্রভাবে আনন্দ ও মিলনের আবেগটি উপরে উপরে চাপাই থাকে, আর সব কিছু ছাপিয়ে বেদনা ও বিরহের অশ্রুসিক্ত করুণমূর্ত্তিটি এ সময়ে অধিক প্রকাশ পায়। প্রত্যেক নারী-জীবনেই এ মুহূর্ত্ত আসে, ব্রতপরায়ণা কুমারীদের জীবনেও একদিন আসবে। পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, শৈশবের ক্রীড়াসহচরী সকলের স্নেহ-প্রীতির ডোর ছিন্ন ক'রে চলে যেতে হবে ভিন্ন এক দেশে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন পরিবারে। নবপরিণীতা চন্দ্রকলার জীবনেও সেই মুহূর্ত্ত সমাগত। আজ তাকে পতিগৃহে যেতে হবে। আসন্ন বিচ্ছেদের মর্ম্মবেদনায় চন্দ্রকলা সাশ্রুনয়না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীকে ছেড়ে কি ক'রে সে দিন যাপন করবে ? তাদের কথা সে কি ক'রে ভুল্‌বে ? হাঁ, উপায় আছে। পুরাতন প্রেমসম্পর্কের উদার আলোকে নূতন পরিবেশে নূতন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে নেওয়া। এতে পুরাতনের মৃত্যু ঘটে না, বরং নূতনের মাঝে সে নব জীবন লাভ করে। তাতে নূতন আরো সুন্দর, আরো মধুময় হয়ে ধরা দেয়। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনকে বরণের এই তো সাধুজনোচিত রীতি। চন্দ্রকলার প্রশ্নের উত্তরে সূর্য্যদেব সে অপূর্ব্ব তত্ত্বের ব্যাখ্যাই দিচ্ছেন। প্রশ্নোত্তরটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

তোমার দেশে যাব সূর্য্য মা বলিব কারে ?
আমার মা তোমার শ্বাশুড়ী মা বলিও তারে।
তোমার দেশে যাব সূর্য্য বাপ বলিব কারে ?
আমার বাপ তোমার শ্বশুর বাপ বলিও তারে।

তোমার দেশে যাব সূর্য্য বইন বলিব কারে ?
আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে।
তোমার দেশে যাব সূর্য্য ভাই বলিব কারে ?
আমার ভাই তোমার দেওর ভাই বলিও তারে।

দাম্পত্য জীবনের চমৎকার সিদ্ধ মন্ত্র। বিবাহের ফলে পতির সঙ্গে পত্নীর একাত্মতা সম্পাদিত হয়। পতির ঘরই তখন পত্নীর ঘর, পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীই তখন পত্নীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী। পতির সুখেই পত্নীর সুখ, পতির দুঃখেই পত্নীর দুঃখ। দু'টি প্রাণের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখ ও নানা সমস্যার সমাধান এখানেই মিলবে। এ সিদ্ধ মন্ত্রটি যদি শিখিয়ে দেওয়া যায়, তবে পতিগৃহের নূতন পরিবেশে আপনার যোগ্য স্থান ক'রে নিতে নব বধূর একটুও বিলম্ব হয় না। আজ যারা কুমারী, কাল তারাই হবে নববধূ। সেই ভাবী বধূ-জীবনের নীতি, আদর্শ ও সাধনার সঙ্কেতও কুমারীরা ব্রতাচরণের মধ্য দিয়েই আয়ত্ত ক'রে নেয়। বিবাহের পূর্ব্বেই বধূচিত মানসিকতা তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠ্‌তে থাকে। আসন্ন দিনের জন্য তারা অগ্রপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। সূর্য্য এবং চন্দ্রকলার বিবাহের বর্ণনার মধ্যে আসলে ওদের নিজেদের ভাবী বিবাহের স্বপ্নই উঁকিঝুঁকি দেয়। কোন্ দিন এক শুভ লগ্নে মস্তকে শোলার মুকুট প'রে সূর্য্যের মতই এক টুক্‌টুকে বর আস্‌বে, ছাদনাতলায় সাতপাক ঘুরিয়ে অগ্নিসাক্ষী ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নববধূর কম্পিত কোমল পাণিখানি পরম প্রেমের আবেগে স্বীয় ব্যগ্র কর প্রসারণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করবে এবং তারপরই বল্‌বে—চল, যাই। শৈশবের খেলাঘর ভেঙ্গে যাবে, আরম্ভ হবে সংসারের সুখ-দুঃখাদির সঙ্ঘাতময় বাস্তব খেলা। পিতৃগৃহে এত দিন ধ'রে তারা যা শিখেছে, এবার দিতে হবে তারই পরীক্ষা। ব্রতের ছড়া গানের মধ্য দিয়ে জীবনের সত্য ও কল্যাণময় ছন্দটিকে যদি তারা যথাযথ উপলব্ধি ক'রে থাকে, তবে তাদের সাধনভ্রষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সংসারের অগ্নিপরীক্ষায় তারা সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় অধ্যায়

সধবার ব্রতচর্য্যা ও ব্যক্তিজীবনে আত্ম-বিকাশের সাধনা

ব্রতচর্য্যার মধ্য দিয়ে পরিবর্দ্ধিতা কুমারী এক্ষণে যৌবনবতী। মাঘ-মণ্ডলের ব্রতমাহাত্ম্যের সূত্র ধ'রেই বলা যায়—যেন সুস্মিত তপনের শুভদৃষ্টি-সম্ভূত রজোমাধুরীর সলজ্জ স্পর্শ লেগেছে ওর শরীরে, ওর মনে। সে সৌর প্রসাদস্পর্শে স্ফুটনোন্মুখ কমলকলিটি আপন পূর্ণতার সমুদয় লক্ষণ অঙ্গে বহন ক'রে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে বিকসিত হয়ে উঠেছে। ষোড়শী চন্দ্রকলা চন্দ্রমার ন্যায়ই ষোল কলায় শোভমানা। কিন্তু, এ রূপৈশ্বর্য্য তো বাহ্যিক এবং ক্ষণিক। কমলটি প্রভাতে প্রস্ফুটিত হয় ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যায় আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পূর্ণিমায় চন্দ্রমার সকল কলার পূর্ণ প্রকাশ, কিন্তু প্রতিপদ থেকে আবার প্রতিদিন এক এক কলা হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে সে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। তেমনি মানুষের জীবন কয় দিনের? তার রূপ-যৌবনের গর্ব্বই বা কতক্ষণের? এই সবই পরিণামশীল। কিন্তু, এ অনিত্য শরীরের খাঁচাটার ভিতরেই এক নিত্য সত্তা বিরাজমান। হৃদ্‌পদ্মের অস্ফুট মুকুলের ভিতরে তাঁর মহান্ অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা চাই। ঐ অস্ফুট মুকুলটির পূর্ণ প্রকাশ আবশ্যক। তজ্জন্য প্রয়োজন সাধনা। সে সাধনা সমগ্র জীবনব্যাপী করণীয়। কুমারীব্রতের মাধ্যমে সে সাধনার সূত্রপাত মাত্র হয়েছিল। কিন্তু, লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে। তাই বিবাহিত জীবনে নারীকে পুনশ্চ ব্রতচারিণীই হতে হয়। ভোগ এবং বৈরাগ্য এ দু'এর ভিতর সমন্বয় বিধান ক'রে তাকে হতে হয় লক্ষ্য প্রাপ্তির সাধনায় অগ্রসর। কিন্তু এ সাধনা কি সহজ?

নারীর সাধনা সুকঠিন

নারীর সাধনা বড় সুকঠিন। তার তপস্যার স্থান জনহীন কান্তারে নয়, অথবা নিভৃত গিরিকন্দরেও নয়—সংসারজীবনের কোলাহলপূর্ণ জনারণ্যে অবস্থান ক'রেই তাকে পূর্ণতার সাধনা করতে হয়। সংসার তার কাছে যা চায়, তা তাকে ষোল আনা বুঝিয়ে দিতে হবে, সেখানে কোন ঘাট্‌তি বা গোঁজামিল চল্‌বে না, অথচ এরই মধ্য দিয়ে চল্‌বে তার আত্মিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়। সেখানে বাধা প্রচুর। বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে সামান্য কয়েকটি দিনের জন্য স্বামী-সোহাগিনীর দিনগুলি হাল্কা দায়িত্বের মধ্য দিয়ে এক রকম কেটে যায়। কিন্তু, ক্রমশঃই সংসারের রূঢ় কর্ত্তব্যভার তাকে বুঝে নিতে হয়। যতই দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পায়, ঝঞ্ঝাটও

ততই বেড়ে চলে। স্বামী-শ্বশুরাদির সেবা, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন, দেবর-ননদিনীদের মনতোষণ, রন্ধন-পরিবেশন, সামাজিক লোক-লৌকিকতা রক্ষা, অতিথি-অভ্যাগতের সম্ভাষণ, রোগীর পরিচর্য্যা, গো-মহিষাদির পালন, দাস-দাসীদের পরিচালন, গৃহাদির পরিমার্জ্জন ও পরিপাট্য বিধান—একাধারে সব তাকে দেখ্‌তে হয়। দশভুজা দুর্গার ন্যায় দশ দিকে দশ হস্ত প্রসারিত ক'রে তাকে কর্ত্তব্য সাধন করতে হয়। কত ঘাত-প্রতিঘাত আসে, কত নিন্দা-ভর্ৎসনাও হয়তো তাকে শুন্‌তে হয়, কিন্তু তাকে হতে হয় ধৈর্য্যে ধরিত্রী। ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, সেবার মূর্তিমতী প্রতিমা হয়ে তাকে সকলের মন জয় করতে হয়। বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি বা ত্যাগ-তিতিক্ষাদির অভাব ঘট্‌লে তখনই তার পতন সম্ভাবনা। সম্রাজ্ঞীর যে রত্নময় সিংহাসনে তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, সেখানে তার আর স্থান হবে না। তবে উপায় কি? এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সংসারজীবনে নারী তার লক্ষ্য ও আদর্শে স্থির থাক্‌তে পারে কি উপায়ে? এ প্রশ্নের বাস্তব মীমাংসার স্বার্থেই সধবাব্রতের উৎপত্তি।

সধবাব্রতের প্রয়োজন ঃ

সধবাব্রতের প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে। নারীজীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্যই তাকে বিবাহিত জীবনেও ব্রতপরায়ণা হতে হয়। পুরুষের ন্যায় নারীরও লক্ষ্য—পরিপূর্ণ আত্মিক বিকাশ। কিন্তু, পাপ-প্রলোভনময় ও স্বার্থকণ্টকিত সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। পথ সত্যই বড় পিচ্ছিল এবং গাঢ় কুয়াসাচ্ছন্ন। লক্ষ্য কখনো কখনো বড় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আত্মবিস্মৃতির ঘোর তমসা জীবনের সকল গৌরবময় সাধনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌তে চায়। পথশ্রমে ক্লান্তি ও অবসন্নতা আসে। এ সকল কঠিন বাধা অতিক্রম করতে না পারলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত। ঋষি এবং মনীষীরা এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কঠিন পরীক্ষাময় সংসারজীবনে নারী যাতে আপন লক্ষ্য, সাধনা ও আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, কখনো আত্মবিস্মৃত না হয়, ক্লান্তি বা অবসাদ, হতাশা বা নৈরাশ্যে কখনো ভেঙ্গে না পড়ে, আত্মিক বল হারিয়ে সে দুর্ব্বল হয়ে না যায়, সুখ-দুঃখের রূঢ় সংঘাতে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্যই তাঁরা সধবাদের পালনীয় অসংখ্য ব্রত-পার্ব্বণের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এ ব্রত-পার্ব্বণ সমুদয় সর্ব্বদা নারীকে তার লক্ষ্য, সাধনা ও আদর্শ সম্বন্ধে জাগ্রৎ রাখে, দুঃখে ও বিপদে তাকে সান্ত্বনা দেয়, হতাশা ও নৈরাশ্যে তাকে আত্মিক বলে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। ত্যাগ, সেবা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষায় স্থির রেখে তাকে সহস্র বাধা-বিঘ্ন জয় করার বীর্য্য দান করে এবং সর্ব্বোপরি তার আত্মিক বিকাশের সহায়ক হয়। কুমারীব্রতের

যে উদ্দেশ্য, সধবাব্রতেরও সেই একই উদ্দেশ্য। তবে উভয়ের মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে, থাকা স্বাভাবিক।

কুমারীব্রত ও সধবাব্রতের প্রকৃতিগত পার্থক্য

কুমারীব্রত ও সধবাব্রতের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেকটাই নির্ভর করে কুমারী ও সধবাদের প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক স্বতন্ত্রতার উপরে। কুমারী ও সধবার মনের গঠন এক প্রকার নয়। কুমারীদের মন কল্পনাপ্রবণ, সধবাদের মন বাস্তবধর্ম্মী; কুমারীদের বুদ্ধি-বিচার অপরিণত, সধবাদের বুদ্ধিবিচার বয়সানু-পাতে ক্রমপরিণত; জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কুমারীদের অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ খুবই কম, সধবারা এদিক থেকে অনেকটা শিক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং, কুমারীদের চিন্তা, কর্ম্ম, শিক্ষা ও সাধন-রীতির প্রকৃতির সঙ্গে সধবাদের চিন্তা, কর্ম্ম, শিক্ষা ও সাধনরীতির প্রকৃতির অনেক পার্থক্য থাক্‌বে, তা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বা-লোচনায় দেখেছি—বালসুলভ প্রবণতাবশতঃ শিশুদের দু'টি জিনিস বড় প্রিয় হয়—পুতুল খেলা এবং ছড়া গান। যাবতীয় কুমারীব্রতের ভিত্তি এ দু'টি বিশেষত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর। নারীকে তার জীবনবোধের একটা মোটামুটি ধারণা বাল্যাবস্থা থেকেই দিবার জন্য তার মানসিক প্রবণতার অনুকূলে যে শুভঙ্কর চেষ্টা চলেছিল, তা থেকেই জন্মলাভ করে ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ কুমারীব্রত। কখনো ছড়াগানের ছন্দে, কখনো পুতুল খেলার আনন্দে এবং কখনো বা ক্ষীরের নাড়ুর স্বাদে ও গন্ধে তার ভিতর উৎসাহ ও পুলক জাগিয়ে প্রায় তার অজ্ঞাতসারেই তাকে দিয়ে তার ভাবী জীবনের অভিপ্রেত কর্ত্তব্যগুলির বিচিত্র মহড়া দেওয়ানো হয়ে থাকে। শৈশবে সে একেবারে অজ্ঞ থাক্‌লেও বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এ সকল ব্রতোৎসবের তাৎপর্য্য কিছু কিছু অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বেই ভাবী জীবনের আদর্শ, কর্ত্তব্য ও সাধনা সম্বন্ধে অন্ততঃ আংশিক চৈতন্যের উন্মেষ তার ঘটে, একথা অস্বীকার করলে কুমারীব্রতকল্পের সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে আরো দেখেছি, বিবাহের পর নারীকে রূঢ় এবং বাস্তব কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। শৈশবের পুতুল খেলা চুকে যায়, তার স্থান এসে অধিকার করে সংসারের হাসিকান্নাময় সত্যিকারের খেলা। কুমারীকালে জীবন সম্বন্ধে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে শিক্ষার সার্থকতা কি—তার পরীক্ষা ও নিরীক্ষার উপযুক্ত সুযোগ বিবাহোত্তর কালে। এই কালে জীবন সম্বন্ধে তার উপলব্ধিকে পরিণত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সে আরো স্পষ্ট ভাবে, আরো গভীর ভাবে জাগ্রৎ ক'রে নিতে চায়, জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে জীবনের মহিমাকে অবগত হতে প্রয়াসী হয় এবং এই ভাবে পূর্ণাঙ্গ, নিষ্কলুষ ও মহিমাদৃপ্ত এক সত্য জীবনের আস্বাদনের কামনাকে মৃত্যুর পূর্ব্বেই সার্থক ক'রে তুলতে ব্রতী হয়। কুমারীব্রতের মধ্যে আশা ও

কল্পনার ভাবটি অধিক, আর সধবাব্রতের মধ্যে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের নিষ্ঠা প্রগাঢ়তর। এ ভাবেই সধবাদের সাধনীয় ব্রত এক নব মহনীয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আরো একটি কথা জানা উচিত যে, সধবাব্রতকল্পও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল প্রাপ্তবয়স্কা নারীর মানসিক প্রবণতা, রুচি, প্রয়োজন, সংস্কার, শিক্ষার মান এবং আরো এরূপ অন্যান্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখেই। এখানেও আমরা দেখি—জবরদস্তি ক'রে কতকগুলি রকমারি অনুষ্ঠানের বোঝা সধবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। পরন্তু এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ক'রে সধবারা স্বেচ্ছায় ব্রতাচরণে আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সধবারা তো আর বালিকা নয় যে তারা ছেলে ভুলানো পুতুল খেলায় সম্মোহিত হবে! তারা বাস্তববাদী। ব্রতাচরণের বাস্তব ফল তারা জান্‌তে চায়। সধবাব্রতে ফলশ্রুতিকীর্ত্তন এক আকর্ষণীয় বস্তু। ধন-সম্পত্তি, সৌভাগ্য-সুখ, অবৈধব্য ও অবন্ধ্যাত্ব, চরিত্রবান্ ও কৃতী সন্তান-সন্ততি লাভ এবং পরিণামে অক্ষয় শান্তি ও বিশ্রাম—এ সকল ফলকীর্ত্তনে সধবা ব্রতগুলি মুখর। অবশ্য এ সকল ফলের কথা কুমারীব্রতেরও সার মর্ম্ম, তা পূর্ব্বে দেখেছি। কিন্তু, তথাপি বলবো—সধবাব্রতের ফলকীর্ত্তন অধিকতর জোরদার। দ্বিতীয়তঃ শিশুরা যেমন পছন্দ করে মনোমুগ্ধকর ছড়া-গান, পরিণতবয়স্কা সধবারা তেমনি মস্‌গুল হয় গল্পের গুঞ্জনে। ঘরের দাওয়ায়, রান্না ঘরে, পুকুর ঘাটে কোনও প্রতিবেশিনীর সাথে কদাচিৎ সাক্ষাৎ হ'লেই অমনি সুখ-দুঃখের অফুরন্ত গল্প সুরু হয়ে যায়—প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা কথাই হয়—হাসি-তামাসার মধ্য দিয়ে শ্রান্ত মনটাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নেওয়ার তাগিদও অনুভূত হয়। এই গল্পপ্রবণতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই সম্ভবতঃ সধবাব্রতকল্পে ব্রতকথার ব্যবস্থা। কোনও প্রবীণা ও অভিজ্ঞা ব্রতিনী ব্রতকথা বলেন, অন্যান্য ব্রতিনীরা ধান্যদূর্ব্বা হস্তে নিয়ে শ্রদ্ধান্বিতা হয়ে তা শ্রবণ করেন। তৃতীয়তঃ এই ব্রতকথার ভিতর দিয়েই এক একটি বিশেষ বিশেষ জীবন ব্রতিনীদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। ধর্ম্মের কি ফল, পাপের কি পরিণাম, ঈশ্বর ও দেবতায় বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারা কি মহৎ ফল পাওয়া যায়, নাস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারাই বা কি অভিসম্পাৎ কুড়িয়ে নিতে হয়—এ সকল দৃষ্টান্ত শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যানের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তারা অধিকতর সচেতন হবার সুযোগ পায়। জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য, আদর্শ, সাধনা ও লক্ষ্য সম্বন্ধেও তারা পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করে। চতুর্থতঃ উপবাস, সংযম, স্নানাদি বাহ্য শুচিতা এবং শ্রদ্ধাদি আন্তর শুচিতার ভিতর দিয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধনা তারা করে, যে সদাচারনিষ্ঠা তাদের ভিতরে পরিস্ফুরিত হয়, তা-ই তাদিগকে উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে আকৃষ্ট করে তোলে। সত্য বলতে কি, এ কৃচ্ছ্রসাধনা ও সদাচারের মধ্য দিয়েই জীবনের নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক মূল্যের উপযুক্ত ভূমিতে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চমতঃ এ সকল ব্রতাচরণে স্বধর্ম্মচারিণী নারীকে যথা সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুনের কঠিন বাধায় তাদিগকে বন্ধ রাখা হয়নি এবং পুরোহিতের প্রাপ্য পরিশোধের বিধানও এখানে বাধ্যতামূলক নয়। ব্রতিনী নিজের পৌরোহিত্য নিজেই করতে পারেন এবং নিজের ভাষাতেই নিজের প্রাণের কামনা দেবতার চরণে নিবেদন করতে পারেন। ষষ্ঠতঃ এ সকল ব্রতের উপচারও অতি স্বল্প এবং সহজলভ্য। এ সকল কারণে পৌরাণিক ব্রতপর্ব্বের চেয়ে লোকায়ত ব্রতগুলিই আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের কাছে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রেছে। তা বলে পৌরাণিক ব্রতপর্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে সে কথা বলা ঠিক হবে না। অধিকতর আগ্রহশীলা ও পুণ্যকামিনী নারীরা পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে যথাবিধানে এবং যথোপকরণে ঐ সকল পৌরাণিক ব্রতের মধ্যে যেটি ইচ্ছা সম্পাদন ক'রে থাকেন। জন্মাষ্টমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত প্রভৃতি এ ধরণের আরো কোন কোন ব্রত আজিও পৌরাণিক বিধানে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। লোকায়ত ব্রত-পর্ব্বকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—(১) ষষ্ঠিব্রতকল্প (২) চণ্ডীব্রতকল্প (৩) লক্ষ্মীব্রতকল্প (৪) সূর্যব্রতকল্প। একটি কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখা ভাল যে, লোকায়ত ব্রতকল্পে সংস্কৃত মন্ত্রতন্ত্রাদির কাঠিন্য না থাকলেও সেগুলির উপর পৌরাণিক ভাবের প্রভাব যথেষ্টই রয়েছে। একই সংস্কৃত ভাষা রূপান্তরিত হয়ে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি, তেমনি একই পৌরাণিক ব্রত রূপান্তর গ্রহণ ক'রে প্রদেশে প্রদেশে বিচিত্র লোকায়ত ব্রতকল্পের জন্মদান করেছে। ভিতরের উদ্দেশ্য ঠিকই আছে, কেবল বাইরের চেহারাটা পালটিয়েছে। বুঝবার সুবিধার জন্য দু'একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরাণিক বুধাষ্টমী ব্রতের 'কথা' বা উপাখ্যানের সহিত কুমারীদের যমপুকুর ব্রতকথার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি। এরূপ আরো কয়েকটি ব্রতের নাম করা যেতে পারে। যেমন পৌরাণিক মানচতুর্থী ব্রত। এই ব্রতে দু'টি মানকচুর পাতা লাগে। একটি পত্রে হর-পার্ব্বতীর পূজা এবং অন্যটিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করতে হয়।* এ ব্রত করলে ব্রতিনী মাননীয়া হন। ঠিক এই ব্রতের অনুকরণে বাঙ্গালীর ঘরে সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রতের আবির্ভাব। আর এ দু'টি ব্রতেরই কাল নির্দ্দিষ্ট হয়েছে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথিতে। ভবিষ্য পুরাণোক্ত ঋষিপঞ্চমী ব্রতের সঙ্গে বাংলার মঙ্গল সংক্রান্তি ব্রতের প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় ব্রতেরই উদ্দেশ্য মেয়েদের ঋতুকালের

* একপত্রে প্রযত্নেন পূজয়েদ্ধরপার্ব্বতীম্ ।
অপরে তু হবিষ্যান্নং ভুঞ্জীত শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥

নিয়ম শিক্ষা। ঋতুকালের নিয়ম ও পবিত্রতা লঙ্ঘন করায় ঋষিপঞ্চমী ব্রতকথার নায়িকা জয়শ্রী নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণপত্নী পর জন্মে কুক্কুরী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তার সম্পর্কদোষে তার ভর্ত্তা সুমিত্র নামক ব্রাহ্মণকে বলীবর্দ্দ হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। ঋষিপঞ্চমী ব্রত করায় উভয়ের মুক্তি ঘটে।

মঙ্গল-সংক্রান্তিব্রতের নায়িকা এক বৃদ্ধা। বীভৎস তার পরিণতি। সে রাত্রের প্রথম প্রহরে শঙ্খ, দ্বিতীয় প্রহরে তাম্রকুণ্ড, তৃতীয় প্রহরে গাভী এবং চতুর্থ প্রহরে রক্তের সরা হয়ে মেজেতে ঘুরে বেড়ায়। শরীর তার কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত, আর পূতিগন্ধময়। অনুসন্ধানে জানা যায়, আসল বৃদ্ধা আর বেঁচে নেই, ওর প্রেতাত্মাই মানুষের রূপ ধ'রে রয়েছে। বুড়ি ঋতুকালের নিষেধ সব কয়টিই লঙ্ঘন করেছিল, তাই ওর মুক্তি হয়নি। ঋতুকালে ব্রাহ্মণ, শঙ্খ, তাম্রকুণ্ড এবং গো স্পর্শ করতে নেই। ৺জন্মাষ্টমী ব্রতটি পৌরাণিক এবং লোকায়ত দ্বিবিধ উপায়েই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কুমারীদের তুলসী তলায় প্রদীপ দান ব্রতের ভিতরে ভবিষ্য পুরাণোক্ত তুলসীব্রতের প্রতিচ্ছায়া সুস্পষ্ট। পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ও আরণ্য ষষ্ঠী ব্রতের অনুকরণে বাংলায় সম উদ্দেশ্যের পরিপোষক অন্ততঃ দেড় ডজন ব্রতের উৎপত্তি। পৌরাণিক ফলসংক্রান্তি-ব্রত আর লোকায়ত ফল-গছানো ব্রত প্রায় সমপর্য্যায়ভুক্ত। পৌরাণিক অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতের সঙ্গেও লোকায়ত অক্ষয়ঘট-ব্রতের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এরূপ আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু, দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি না ক'রে মূল আলোচনায় ফিরে যেতে চাই।

সধবাব্রতের বিবরণ

সমগ্র সধবাব্রতকল্প চারিটি ভাগে বিভক্ত। আশা করি, পাঠকগণ তা স্মরণে রেখেছেন। ধন-সম্পৎ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধিকল্পে দেবী লক্ষ্মীর, সন্তানের কল্যাণার্থে ষষ্ঠীর এবং স্বামী-পুত্রাদি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করা হয়, তাও সম্ভবতঃ মাননীয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নি। সধবা মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ষষ্ঠী, চণ্ডী ও লক্ষ্মীর আরাধনামূলক এই ব্রতকল্প বহু শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। লক্ষ্মীব্রত অভ্যুদয়কামা গৃহিণীদের সাপ্তাহিক কৃত্য। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁরা লক্ষ্মীব্রত উদ্‌যাপন ক'রে থাকেন। বারোমেসে ব্রতকথা আছে। আবার কার্ত্তিক, পৌষ, চৈত্রাদি বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ ব্রতকথার সাহায্যে ব্রতোদ্‌যাপন করা হ'য়ে থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গে বহুল-অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রব্রত আসলে ক্ষেত্র-লক্ষ্মীরই পূজা।

বৃহস্পতি বারে যেমন লক্ষ্মীব্রত, মঙ্গলবারে তেমনি মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। বারোমেসে ব্রত আছে। হরিষমঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী,

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, **নাটাইচণ্ডী** নামে ভিন্ন ভিন্ন কালে আচরণীয় কয়েকটি ব্রতের সাক্ষাৎকার আমরা পাই। সুয়ো-দুয়োর ব্রতও আসলে চণ্ডীরই আরাধনা। এ ভাবে ষষ্ঠীব্রতেরও এক তালিকা পেশ করা যায়। আরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত অতি প্রসিদ্ধ। তা পুরোহিতের দ্বারা শাস্ত্রীয় প্রণালীতেও উদ্‌যাপন করা যায়, আবার মেয়েরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতেও সম্পাদন করতে পারেন। এছাড়া আছে **লোটন ষষ্ঠী**, **চাপড়া ষষ্ঠী**, **দুর্গা ষষ্ঠী**, **মূলা ষষ্ঠী**, **পাটাই ষষ্ঠী**, **শীতল ষষ্ঠী**, **অশোক ষষ্ঠী**, **নীল ষষ্ঠী** প্রভৃতি। বিবিধ লোকায়ত ব্রতকল্পের মধ্যে এয়ো সংক্রান্তি ব্রত, নিৎ সিন্দূর ব্রত, সন্ধ্যামণি ব্রত, সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত, ফল গছানো ব্রত, অক্ষয়ঘট ব্রত, বিপত্তারিণী ব্রতের উপযোগিতার উল্লেখ আমরা পরে পাবো। এ ছাড়া গুপ্তভাবে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদানমূলক **গুপ্তধন ব্রত**, ব্রাহ্মণকে ভোজ্য-বস্ত্রাদি সহ মধুভাণ্ড দানমূলক **মধু-সংক্রান্তি ব্রত**, নারীর রূপচর্য্যামূলক **নখছুটের ব্রত** ও **রূপহলুদ ব্রত**, কুমারীপূজামূলক **অক্ষয়কুমারী ব্রত**, ব্রাহ্মণ ও সধবার পূজার্থে আয়োজিত **আদর সিংহাসন ব্রত**, সূর্য্যের উপাসনামূলক **ইতু ব্রত**, **অমাবস্যা ব্রত**, **রালদুর্গা ব্রত** ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল ব্রতের সব গুলিই যে অদ্যাপি জীবিত আছে তা বলা হয়তো ঠিক হবে না। বর্ত্তমান যুগে অনেক-গুলিই অপ্রচলিত। কিন্তু, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা ব্রত-পার্ব্বণাদির সামগ্রিক মূল্যবোধ সাধারণের দৃষ্টির ভিতরে নিয়ে আসতে চাই। সুতরাং, প্রচলিতই হোক বা অপ্রচলিতই হোক, আলোচনার ক্ষেত্র থেকে কোনটিকেই নির্ব্বাসন দেওয়ার ইচ্ছা নেই।

লোকায়ত ব্রতপর্ব্বের সামগ্রিক শিক্ষা কি? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হ'লে আমাদিগকে প্রবেশ করতে হবে বৈচিত্র্যময় ব্রতোপাখ্যান সমূহের ভিতরে। ব্রতকাহিনীই আমাদিগকে ব'লে দেবে—ঠিক কি উদ্দেশ্যে ব্রতটি আরম্ভ করা হয় এবং জীবন ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সে ব্রত থেকে কি কি উপদেশ বা কি কি শিক্ষা গ্রহণ করার আছে।

ব্রতোপাখ্যান কি সত্য?

ব্রতকথার রহস্য বিষয়ক আলোচনার আরম্ভেই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক, তা হলো এই—ব্রতকথাগুলি কি সত্য? বাস্তবে এমন সব ঘটনা কি কদাপি ঘটেছিল? না, এ সব কাহিনী নিছক কল্পিত? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের বাস্তব বিচার-বুদ্ধির পরিমাপে এ সকল ব্রতোপাখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে মনে নানা সন্দেহ-সংশয়ই উঁকিঝুঁকি দিবে। কেউ হয়তো বল্‌বেন —এ গুলি ভিত্তিহীন আষাঢ়ে গল্প বিশেষ; কেউ হয়তো বল্‌বেন—এগুলি উপকথা মাত্র; আবার কেউ হয়তো বল্‌বেন—এগুল

অলৌকিক, অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব কাহিনীর উঁচু পাহাড়। কিন্তু যে যা বলেন বলুন, এ সকল ব্রতোপাখ্যানের গভীর উদ্দেশ্য আছে, তা স্বীকার্য্য। কুমারীব্রতের অর্থহীন ছড়ার মধ্যেও যেমন বিক্ষিপ্ত ভাবে অজস্র অর্থপূর্ণ সম্পৎ আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সমগ্র ভাবে ব্রতের ছড়াগুলি শেষ পর্যন্ত বিশেষ তাৎপর্য্যের আকর ব'লেই প্রতিপন্ন হয়েছে, তেমনি বহু কিছু অলৌকিক, অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব কথা থাকা সত্ত্বেও প্রাগুক্ত ব্রতোপাখ্যান সমুদয় নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্যের পরিপোষক। গল্প বা উপাখ্যান সর্ব্বদাই সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হয় না। কল্পিত অনেক কাহিনীই আছে যা লোকশিক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। পুরাণাদিতে এরূপ শত শত কাহিনী আছে। অমর মহাকাব্য মহাভারতে ছোট বড় অসংখ্য গল্প আছে, যার নায়ক-নায়িকা মনুষ্যেতর পশু বা পক্ষী, কিন্তু প্রতিটি উপাখ্যান নীতিশিক্ষায় পূর্ণ। মানুষকে সত্য পথে সুস্থিত ক'রে ধরে রাখবার বিশেষ উপায়রূপেই ঐ কাহিনীসমূহ রচিত ও প্রচারিত। বিশেষতঃ সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষকে ধর্ম্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেবার পক্ষে ঐ উপাখ্যানসমূহ খুবই উপযোগী। এ অর্থেই ঐ উপাখ্যানগুলি সত্য—ষোল আনা সত্য। জীবনকে সত্যে ও ঋতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যে অকৃপণ সাহায্য দান করে তাকে সত্য কেন বলবো না? ব্রতোপাখ্যান সমুদয়ের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ঘটনাগুলির বাস্তব উৎপত্তির কোনও প্রমাণ থাক বা না থাক, তবু বল্‌বো সেগুলি সত্যই। কেন না, জীবনের সত্য আদর্শ ও সাধনার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা জাগ্রত করতে ওরা প্রচুর সাহায্য করে। কুমারীকালে ছড়াগানের মধ্যে দিয়ে যে জীবনমন্ত্র নারী লাভ করেছিল, উত্তর কালে বিবাহিত জীবনে সে মন্ত্রকে চরিত্রগত করার বাস্তব সাধনায় এ-সকল ব্রতোপাখ্যানের শিক্ষা মহত্তর ভূমিকা নিয়ে কাজ করেছে। বস্তুতঃ হিন্দুনারীর নৈতিক ও ধর্ম্মীয় জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে এ সকল ব্রত এবং ব্রতোপাখ্যান। সুতরাং, আর যাই হোক, এগুলি আদৌ অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার বস্তু নয়।

ব্রতের ন্যায় ব্রতকথাও দ্বিবিধ—পৌরাণিক ও লোকায়ত। পৌরাণিক ব্রতের নানা উপাখ্যান পরবর্ত্তী আলোচনার নানা প্রসঙ্গে আসবে। তখন সেগুলির সম্বন্ধে আমরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবো। এ অধ্যায়ে যে-সব ব্রতকথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে, তা সবই লোকায়ত। এ লোকায়ত ব্রতকথার আয়তনও খুব কম নয়। তবে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, তজ্জন্য খুব সংক্ষেপেই আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করার চেষ্টা হবে। প্রথমে ষষ্ঠীপর্ব্ব, তৎপরে যথাক্রমে চণ্ডীপর্ব্ব, লক্ষ্মীপর্ব্ব এবং সূর্য্যপর্ব্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

ষষ্ঠীপর্ব্ব

পল্লীজননীরা আরণ্য ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে তাঁদের অভ্যস্ত যে লোকায়ত ব্রতকাহিনী ব'লে থাকেন, তার মাহাত্ম্য অতি সুন্দর। আরণ্য ষষ্ঠীর ব্রতের উদ্দেশ্য যদি হয় সন্তান-সন্ততির পরম কল্যাণ সাধন, তবে সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দেবভক্তিপরায়ণা, সত্যবাদিনী, ব্রতচারিণী ও নির্ল্লোভচিত্তা জননী। মা যদি ভক্তিপরায়ণা, সংযমশীলা ও নির্ল্লোভা না হন, যদি তাঁর সত্যনিষ্ঠা না থাকে, তবে সন্তানের সর্ব্বা ম কল্যাণ হতে পারে কি? ব্রতকথায় এ আদর্শের সূচনাই দেওয়া হয়েছে। কোনও গৃহস্থের ঘরে এক হা-ভাতে বৌ ছিল। লোভের বশবর্ত্তিনী হয়ে বউটি ঘরের খাদ্য বস্তু চুরি করে খেতো এবং শাশুড়ী প্রশ্ন করলে বিড়ালের নামে অপবাদ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো। লোভ এবং মিথ্যা দ্বিবিধ পাপের ফলে হতভাগিনী একে একে সাতটি পুত্র এবং সাতটি কন্যা প্রসব করা সত্ত্বেও একজনকেও ধ'রে রাখতে পারে না। রাত্রে সে সন্তান কোলে ক'রে শুয়ে থাকে, সকালে উঠে দেখে সন্তান নেই। কি আশ্চর্য্য, এতগুলি সন্তান গেল কোথায়? বউটা কি তবে রাক্ষুসী? নিজের সন্তান নিজেই ধ'রে ধ'রে খায়? সবাই এরূপ সন্দেহ করে। দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে লোকাপবাদক্লিষ্টা বধূটির দু:সহ জীবন। শেষে একদিন পোড়াকপালী ঘর ছেড়ে চলে যায় বনে। বনে এক বৃক্ষের ছায়ায় অনুতপ্ত হৃদয়ে বধূটি যখন কেঁদে কেঁদে আকুল, সেই সময় করুণাময়ী দেবী ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তাকে স্বয়ং দর্শন দেন এবং বলেন যে, লোভবশতঃ নিজে খেয়ে বিড়ালের নামে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে তিনিই তার সন্তান-সন্ততিগুলি লুকিয়ে রেখেছেন। সন্তানহীনা বধূটি দেবীর চরণ দু'টি ধ'রে ক্ষমা চাইলে, দেবী বলেন—"ঐ একটা মরা পচা বেড়াল পড়ে আছে। ওর গায়ে এক হাঁড়ি দই ঢেলে দিয়ে জিভে করে চেটে আবার তুলে নিয়ে আয়, তবেই তোর ছেলেমেয়েদের ফিরে পাবি। লোভের প্রায়শ্চিত্তের এক অত্যদ্ভুত বিধান। বধূটি অবশ্য তা-ই করে এবং দেবীর কৃপায় সন্তান-সন্ততিগুলিকেও ফিরে পায়।

ভোজনলালসা যেমন জননীর চরিত্রের এক দূষণীয় দিক, পরধনলালসাও তেমনি। চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাতক। এতে নারীর নিজ চরিত্রও অবনমিত হয়, আর ভবিষ্যতে মায়ের অনুকরণে সন্তানও চৌর্য্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে অধঃপতিত হতে পারে। সুতরাং, কোন নারী, বিশেষতঃ সন্তানবতী জননী যেন গোপনে পরধনহরণে উৎসাহিত না হন। সত্য একদিন সূর্য্যালোকের মত স্বতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়েই। তখন লোকনিন্দার আর অবধি থাকে না। লোকনিন্দা মৃত্যুর চেয়েও দুঃখদায়ক। লুণ্ঠন ষষ্ঠীর ব্রতকথায় এই কথাগুলিই বোঝাবার

চেষ্টা। কোনও গৃহ থেকে তিনটে সোনার লোটন চুরি যায়; "লোটন নিল কে?"—গৃহিণীর প্রশ্ন। পুত্রবধূ এবং কন্যা দু'জনেই নিজেকে নিরপরাধা ব'লে ঘোষণা করে। পুত্রবধূ ছেলের মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে—"আমি নিইনি, যদি নিয়ে থাকি তবে যেন সাত বেটার মাথা খাই।" কন্যা বলে—"আমি তো আজ আছি কাল নেই, আমাকে সন্দেহ করছো কেন?" তবে চোর কে? প্রথম দৃষ্টিতে পুত্রবধূই চোর সাব্যস্ত হয়। কারণ, যেই মাত্র প্রতিজ্ঞা করা, অমনি তার সাত সাতটি সোনার ছেলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। আসলে কন্যাই কিন্তু অপরাধিনী, পুত্রবধূ নিরপরাধা। তবে তার এ কঠিন দণ্ড কেন? সন্তানগুলির জীবননাশ তো হলোই, লোকাপবাদেরও আর পরিসীমা নেই। বধূটি রুদ্ধদ্বার গৃহে সারা দিন ধ'রে কেবল কাঁদে। তার দুঃখে মা ষষ্ঠীর দয়া হয়। তিনি আবির্ভূ তা হয়ে শোকমগ্না বধূকে বলেন—"তুই চুরি করিস নি ঠিক, কিন্তু ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করলি কেন? আর কখনো করবি নে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে নেই।" দেবী বাঁশ পাতার জল ছিটিয়ে ছেলেগুলিকে বাঁচিয়ে দেন। এ ঘটনার পর অপর দিকে প্রকৃত অপরাধিনীর তিনটি ছেলে গতায়ুঃ। অপরাধিনী কেঁদে কেটে অস্থির। দৈববাণী হয়—"মাগী, তুই নিজে চুরি ক'রে পরের মেয়ের উপর দোষ দিস্। যা, ভাল চাস্ তো বউ এর পায়ে ধরগে যা।" ভ্রাতৃবধূর পদবন্দনা এবং তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে ঐ বাঁশ পাতার জল সিঞ্চন ক'রে কন্যাও তার তিনটি পুত্রের প্রাণ ফিরে পায়। তখন পাড়াময় পুত্রবধূর কি সুখ্যাতি, আর কন্যার অপযশঃ।

তুমি কি দেবতার শ্রেষ্ঠ করুণা পেতে চাও? তবে তোমাকে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটি দেবতার প্রীতির জন্য উৎসর্গ করার সৎ সাহস অর্জ্জন করতে হবে। ইষ্টকে তুমি কতখানি ভালবাস, তার যথার্থ পরীক্ষা সেখানেই। চাপড়া ষষ্ঠীর ব্রতে কোনও ভক্ত এরূপ এক অত্যাশ্চর্য্য অথচ মারাত্মক পরীক্ষাই দেন। গল্পটি এই: কোনও সদাগর পুকুর কাটেন, কিন্তু তাতে জল উঠে না। বর্ষা কালেও না। প্রতিবেশীরা কানাকানি করে—সদাগর বড় পাপিষ্ঠ। এদিকে চাপড়া ষষ্ঠীব্রতের দিন আসন্ন। পুকুর ঘাটে ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে জলে চাপড়া ভাসাতে হয়। গিন্নী চিন্তিতা—এবারেও কি আবার পরের পুকুরেই যেতে হবে?

মা ষষ্ঠী ভক্তকে ছলনা করার জন্য সদাগরকে রাত্রে স্বপ্ন দেখান—তুই ছোট বউ-এর ছোট ছেলেকে কেটে যদি তার রক্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে পারিস, তবে পুকুরে জল হবে, নইলে নয়। স্বপ্নবার্ত্তায় সদাগর অতিশয় শোকার্ত্ত ও মুহ্যমান। তথাপি, ষষ্ঠীর প্রসন্নতার জন্য গোপনে প্রিয়তম নাতিটিকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে বলিদান করেন। অমনি জলসঞ্চারে পুকুর কানায় কানায়

ভর্ত্তি হয়ে উঠে। পর দিন গিন্নী এবং তিন পুত্রবধূ ঘাটে ব্রত করতে যায়। সকলের শেষে ছোট বউ যখন জলে চাপড়া ভাসাতে নাবে, অম্‌নি জল থেকে সেই শিশুটি মায়ের আঁচল ধ'রে ভেসে উঠে। "একি! একি! তুই কোথা গিয়েছিলি?" মা জিজ্ঞাসা করেন পুত্রকে। পুত্র ভয়ে কিছু জবাব দিতে পারে না। কিন্তু, ক্রমে সব ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ছোট বউ তো ঘটনা শুনে অজ্ঞান। মা ষষ্ঠীর কৃপায় তার জ্ঞান ফিরে আসে। অতঃপর সকলে মিলে ব্রত উদ্‌যাপন করে। সদাগর-পরিবারের খুব ধন-দৌলত হয়।

মা ষষ্ঠীর ব্রত এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ যে স্বয়ং জগজ্জননী দুর্গাও এ ব্রতের উপদেশ দান করেন। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিকে বলা হয় দুর্গাষষ্ঠী। এ তিথিতেই মা দুর্গা কার্ত্তিকেয়-গণেশের ন্যায় দু'টি সুপুত্র লাভ করেছিলেন। গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে দেহচ্যুত হয়েছিল। পরে এক হস্তিমুণ্ড এনে গণেশের গ্রীবায় সংযোজিত করা হয়। মরা ছেলে আবার বেঁচে উঠে। দুর্গাষষ্ঠী ব্রত যিনি করেন, তাঁরও কার্ত্তিকেয়-গণেশের ন্যায় সুপুত্র হয় এবং সে পুত্রেরা দীর্ঘ জীবন লাভ করে; তাদের অকাল মৃত্যু হয় না।

মা ষষ্ঠীর কৃপা শুধু কি মনুষ্যসন্তানের উপরেই সীমাবদ্ধ? না, তা নয়। তাঁর করুণা মনুষ্যেতর জীবের সন্তান-সন্ততির উপরেও সমভাবে নিত্য বর্ষিত। আদর্শ জননী যিনি, তিনিও নিজ সন্তান, প্রতিবেশিনীর সন্তান এবং ইতর জীবের শিশুসন্তানদের উপর সমান বাৎসল্যের দৃষ্টি রাখবেন। এখানেই তো মাতৃত্বের মহিমার পরিপূর্ণতা। মূলা ষষ্ঠীর ব্রতকথায় দেখা যায়, কোনও দেশে এক ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে এক মৃত গোবৎসের জীবন দান করেছিল। ঘটনার সূত্রপাত এই ভাবে হয়। ব্রাহ্মণ একদিন কিছুটা হরিণের মাংস এনে পুত্রবধূকে রান্না করতে দেন। পুত্রবধূ ঝিকে ডেকে মাংস চাখ্‌তে দিয়ে বলে—"দেখ্‌তো, নুন ঝাল হয়েছে কি না?" ঝি বলে সে গরমের জন্য কিছু বুঝতে পারে নি। পুত্রবধূ আবার চাখ্‌তে দেয়। এবারেও সে কিছু স্বাদ পায় নি, জানায়। এমনি ক'রে লোভের বশবর্ত্তিনী হয়ে বার বার চাখ্‌তে চাখ্‌তে অল্প পরিমাণ মাংসের সবটাই ঝি খেয়ে ফেলে। এখন উপায়? ঝি বাজারে যায় মাংস কিন্‌তে। কিন্তু পায় না। সামনে বাগানের মধ্যে একটা মৃত গোবৎস দেখে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ঝি-টা তারই খানিকটা কেটে এনে মনিবের পুত্রবধূকে রান্না করতে দেয়। ব্রাহ্মণের ঘরে গোমাংস—ঝি-টার কি অন্যায় বেয়াদপি। তবে রক্ষা এই—গোমাংস সিদ্ধ হয় না। এদিকে ব্রাহ্মণের আহারের সময় আসন্ন। পুত্রবধূ মহা সঙ্কটে পড়ে। শ্বশুরকে খেতে দেবে কি দিয়ে? বুদ্ধিমতীকে একটা উপায় স্থির করতে হয়। সংসার রক্ষা করতে হলে মাঝে মাঝে এমন সময়োচিত প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের প্রয়োজন আছে। পুত্রবধূ

ঝিকে বলে—"তুই পথে জল ঢেলে রাখ, আমি ভাতের থালা নিয়ে ছল ক'রে পিছ্লিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাব, সে সময় তুই রান্না ঘরে ঢুকে এক ঘটি জল এনে অমার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিবি। ফলে ভাতের থালা তো নষ্ট হ'বেই, তোর স্পর্শে হেঁসেলের অন্যান্য ব্যঞ্জনও আর ব্রাহ্মণের ঘরে চল্‌বে না।" পরিকল্পনা মত তা-ই করা হয়। ফলে, ব্রাহ্মণ গোমাংস ভক্ষণের পাপ থেকে রক্ষা পান। পুত্রবধূ জান্‌তো না যে পাপিষ্ঠা ঝি গোমাংস এনেছে। পরে ঝি তা স্বীকার করে। পুত্রবধূ ষষ্ঠীর পূজা ক'রে ঐ গো-বৎসের উপর নির্ম্মাল্য ছড়িয়ে দিতে বৎসটি বেঁচে উঠে। পরে ব্রাহ্মণ সব ঘটনা শুনে পুত্রবধূকে খুব প্রশংসা করেন। এদিন থেকে নিয়ম হয় অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠীতে কেউ মাছ-মাংস খাবে না, খেলে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য পাপ হবে। ঐ তিথিতে মূলোর তরকারী দিয়ে রুটি খাবে।

অরণ্যে যেমন আরণ্য ষষ্ঠী, জলে তেমনি জলষষ্ঠী। সন্তান-সন্ততি জলে ডুবে না মরে, সেই অভিপ্রায়েই কোন কোন দেশে জলষষ্ঠীর ব্রত প্রচলিত। ব্রতের পূর্ব্বদিন উপবাস, পর দিন ব্রতান্তে নিরামিষ আহার। ভোগের পায়স অর্দ্ধাংশ জলষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে জলে এবং অর্দ্ধাংশ প্রসাদস্বরূপ সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বিতরণ—এই হলো ব্রতের নিয়ম। এ ব্রতের কোন কথা নেই, আছে এক প্রার্থনা মন্ত্র।*

জলষষ্ঠীর পর পাটাই ষষ্ঠীর ব্রতকথা। এ ব্রত হয় পৌষ মাসে। ধোপার পাট থেকে পাটাই শব্দের ব্যুৎপত্তি। উঠনে ছোট কৃত্রিম এক পুকুর কেটে তাতে ঘাট ও পাট তৈরী ক'রে ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। ব্রতের একটি নৈবেদ্য ধোপানীর প্রাপ্য। সন্তানকল্যাণে এ-ব্রতের উপযোগিতা কি? জননীকে ভক্তিপরায়ণা ও নির্লোভা তো হতে হবেই, অধিকন্তু তাকে হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের কাপড়-চোপড় সর্ব্বদা কেচেকুচে ধব্‌ধবে রাখা উচিত। "আলনায় কাপড় দলমল করে"—কুমারী-জীবনের সে প্রতিজ্ঞা কার্য্যতঃ রূপায়নের সময় এখন সমুপস্থিত। পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ্‌লে সভ্য সমাজে আদর হয় এবং তাতে আধি-ব্যাধির আক্রমণও সহসা হয় না। সুতরাং, ছেলেপুলেরও অকাল মরণের ভয় অনেকাংশে তিরোহিত হয়। আমার মনে হয়, পাটাই ষষ্ঠীর ব্রতের উদ্দেশ্য এরূপ কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। ব্রতকথার তাৎপর্য্য অনুসরণ ক'রেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ব্রতকথায় আছে,

---

* জলষষ্ঠী মাগো আমার পূজা নাও।
সন্তান-সন্ততি প্রতি অভয় পদ দাও॥
অভয় দিয়ে মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর।
দুঃখিনী তোমার কন্যার পূজা গ্রহণ কর॥

কোনও দেশে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তার পুত্রবধূকে নিয়ে বসবাস করতো। পুত্রবধূটি বড় লোভপরায়ণা—ব্রতপূজা তো কিছু করতোই না, অধিকন্তু ব্রতের নৈবেদ্য থেকে পছন্দ মত ফলমূল, মিষ্টি তুলে শাশুড়ীর অজ্ঞাতসারে খেয়ে নিত। এই গর্হিত স্বভাবের জন্য তার ছেলে হয়, আর মরে। তবু কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। নিপুণা গৃহিণী ব্রাহ্মণী বধূর কল্যাণে এবং বংশের কল্যাণে পাটাই ষণ্ঠী ব্রতের আয়োজন করেন। পাছে বধূ নৈবেদ্য নষ্ট করে, এই বিচারে তাকে এক রাশ কাপড়-চোপড় দিয়ে পুকুরঘাটে পাঠিয়ে দেন, সেগুলিকে কেচে আন্‌তে। এ দিকে উঠুনে কৃত্রিম পুকুরঘাটে পাটাই ষণ্ঠী ব্রত চল্‌ছে। সহসা শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠে। "নৈবেদ্য খাব" এই লোভে বধূটি পুকুর ঘাটে কাপড়-চোপড়গুলি ফেলে রেখে উদ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটে আসতে থাকে। কিন্তু, নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে পথে খায় এক দারুণ হোঁচট্। হুমড়ি খেয়ে পড়েই অজ্ঞান। সেই পথেই ধোপানী আস্‌ছিল তার প্রাপ্য নৈবেদ্যের ভাগ নিতে। পথে বউকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে সে বাড়ীতে এসে খবর দেয়। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বউকে তুলে নিয়ে আসেন। হোঁচট্ খেয়ে তার শুভ বুদ্ধির উদয়। ব্রাহ্মণী বউকে দিয়েও পাটাই ষণ্ঠী ব্রত করান এবং বর মেগে নিতে উপদেশ দেন। মা ষণ্ঠীর কৃপায় বধূটির লোভপরায়ণতা দূর হয়, এর পর তার ছেলেপুলেও আর মরে নি।

মা ষষ্ঠী যেখানে কৃপাপরায়ণা, সেখানে নারী বহু সন্তানশালিনী হয়, আবার তিনি রুষ্টা হলে একটি সন্তানও জীবিত থাকে না। সুতরাং, পূজার্চ্চনা ও নিয়ম পালনাদির দ্বারা দেবীকে সর্ব্বদা প্রসন্না রাখাই কর্ত্তব্য—শীতলষণ্ঠী ব্রতকথার এই হলো মর্ম্ম। গল্পটি এই ঃ কোনও দেশে এক ব্রাহ্মণী বাস করতো। তার একমাত্র পুত্রবধূর কোনও সন্তান-সন্ততি হয় না। ব্রাহ্মণী ষণ্ঠীর ব্রত ক'রে কাতর ভাবে প্রার্থনা করতে বধূ অন্তঃসত্ত্বা। দশ মাস কাটে, তবু কিন্তু প্রসব হয় না। শেষে একদা পুকুর ঘাটে হোঁচট্ খেয়ে পড়াতে সেই চাপে বধূ এক মাংসের থলি প্রসব করে। একটা কাক মাংসের লোভে সেই থলিটি ঠুক্‌রে ছিঁড়ে ফেলে। তখন সকলে আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, সেই থলিটার ভিতর ষাট্‌টি ছেলে কিল্‌বিল্ করছে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সকলেই খুব উৎফুল্ল। ছেলেগুলিকে বাড়ীতে এনে জাতকর্ম্মাদি করান। ক্রমে তারা বড় হয়। ব্রাহ্মণীর প্রাণের আশা—এবার নাতিদের বিয়ে দেবেন। কিন্তু, পত্রবধূর সঙ্কল্প, যার ঘরে ষাট্ কন্যা আছে, এমন পরিবার না পেলে সে পুত্রদের বিয়েই দেবে না। ব্রাহ্মণী তো বড় মুস্কিলে পড়েন। কোথায় পাবেন এক গর্ভজাত ষাট্‌টি কন্যা? মা ষণ্ঠীর এত রাশীকৃত করুণা কোন্ ভাগ্যবতী রমণীর উপর বর্ষিত? তিনি দেশদেশান্তর খুঁজে বেড়ান। সৌভাগ্যবশতঃ এমন একটি

পরিবার শেষে পেয়েও যান। একঘরে ষাট্‌টি মেয়ে পাওয়ায় ব্রাহ্মণী বলে—"দেখলে, মা ষষ্ঠী বউমার কোট বজায় রেখেছেন।" শুভদিনে শুভ ক্ষণে নাতিদের বিয়ে হয়ে যায়।

ষাট্ নাতি, আর ষাট্ নাত-বৌ। ব্রাহ্মণীর কত আনন্দ! তার ঘরখানি যেন সর্ব্বদা আলোকিত। এমন সংসার কয় জনের আছে? এ সবই মা ষষ্ঠীর করুণার দান। কিন্তু, এক দিন বুড়ির দুর্ব্বুদ্ধি। মাঘ মাসে শীতল ষষ্ঠীর দিন সে গরম জলে স্নান করে, আর গরম ভাত খায়। ঐ দিন উনুন জ্বালতে নেই, ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়, আর দইপান্তা গোটা সিদ্ধ (আলু, বেগুন প্রভৃতি যে আনাজ সিদ্ধ খাবে তা অখণ্ড অবস্থায় রন্ধন করতে হবে) খেয়ে শীতল ষষ্ঠী করতে হয়। বুড়ি তা ভুলেই গেছে, ওর বোধ হয় ভীমরতি ধরেছে। মা ষষ্ঠীর অনভিপ্রেত কাজ করার পরিণাম ভাল নয়। ষাট্ নাতি, ষাট্ নাত-বৌ, এমন কি বাড়ীর কুকুরটা পর্য্যন্ত সব মরে যায়। ব্রাহ্মণী বুড়ি ঝড়ে ভাঙ্গা কলাগাছের মত শোকাহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার কান্নার আর অবধি নেই। মা ষষ্ঠী এক বুড়ির বেশে এসে ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার ক'রে বলেন—"কেন, ভাল ক'রে গরম জলে স্নান কর, আর গরম ভাত খা।" ব্রাহ্মণী দেবীর চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং পরিত্রাণ ভিক্ষা চান। দেবী মৃতদের পুনর্জ্জীবন লাভের উপায় ব'লে দিয়ে অন্তর্হিতা।

শীতল ষষ্ঠী দিবসে স্নানাহারের বিশেষ নিয়ম স্থাপন করা হয়েছে।

শীতল ষষ্ঠীর পর অশোক ষষ্ঠী। অশোক ষষ্ঠী ব্রতকথার প্রধান নায়িকা অশোকা। এক হরিণীর গর্ভে তার জন্ম। কোনও মুনি তাকে লালন-পালন করেন এবং এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিবাহান্তে অশোকা যখন পতিগৃহে যায়, তখন মুনি কতকগুলি অশোকের ফুল ও বীজ অশোকার হাতে দিয়ে বলেন—"এই ফুলগুলি শুকিয়ে রেখো, চৈত্র মাসের অশোক ষষ্ঠীর দিন খাবে। আর বীজগুলি ছড়াতে ছড়াতে যাও, রাজপুরী পর্য্যন্ত অশোকের গাছ হবে। যদি কখনো বিপদে পড়, তবে অশোক গাছের চিহ্ন ধ'রে আশ্রমে আসবে।"

অশোকা পতিগৃহে। তার সাত ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে মেয়েদের বিবাহ হয়েছে, শ্বশুড়-শাশুড়ীও স্বর্গে চলে গেছেন। অশোকাই এখন সাত বউয়ের শাশুড়ী। চৈত্র মাসের অশোক ষষ্ঠীর দিন শ্বশুরের শ্রাদ্ধান্তে অশোকা বউদের দিয়ে মুগকলাই সিদ্ধ করিয়ে খায়। পর দিন এক নিদারুণ বিয়োগান্তক ঘটনা। ঘরে কেউ আর বেঁচে নেই। কেন এমনটি হলো? অশোকা কিছুই বুঝতে পারে না, সে শুধু শোকে অধীরা হয়ে কাঁদে। সহসা মনে পড়ে মুনির কথা, যিনি অশোকার পালক পিতা। অশোক বৃক্ষের তলে জন্ম হয়েছিল ব'লে

মুনি আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন অশোকা। সেই স্নেহময় পালক পিতার বাক্য স্মরণ ক'রে অশোক বৃক্ষের চিহ্ন ধ'রে পথ চিনে অশোকা মুনির আশ্রমে উপস্থিত। সাশ্রু নয়নে, কাতর ভাবে নিজ দুর্ভাগ্যের কথা সমুদয় নিবেদন করে। মুনি বলেন—"অপরাধ কিছু হয়েছে। মুগ কড়াই সিদ্ধ করার জন্য যে ঘুঁটের আগুন ধরানো হয়েছিল, সেই ঘুঁটেতে একটা ধান ছিল। ধানটা ফুটে খই হয়ে মুগ কড়াইয়ের হাঁড়িতে গিয়ে পড়ে। অশোক ষষ্ঠীর দিন অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু, ঐ খইটা তুই খেয়ে ফেলেছিস্। তাতেই এই দুর্দ্দৈব।" মুনি আশ্বাস দিয়ে আবার বলেন—"কোন ভয় নেই। এই কমণ্ডলুর জল নিয়ে গিয়ে সিঞ্চন কর, সবাই প্রাণ লাভ করবে।" অশোকা তা-ই করে।

অশোক ষষ্ঠী ব্রতের তাৎপর্য্য দ্বিবিধ—নৈতিক এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। জীবনের ব্রতসাধনা নিখুঁত ভাবেই করা উচিত। সেখানে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি মহত্ত্বয়ের কারণ হতে পারে। বিচ্যুতি বা অপরাধ ছোট ব'লেই তা কখনো উপেক্ষণীয় নয়। এ হলো এ ব্রতের নৈতিক শিক্ষা। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা হলো এই, অশোক এক মহৌষধি—স্ত্রী-ব্যাধিতে এর উপযোগিতা অপরিসীম। নিজ শরীরকে যৌনব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে হলে এ ঔষধি বিশেষের সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় থাকা ভাল। মাতা বা পিতার যৌন ব্যাধির জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি রুগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল, অক্ষম, উন্মাদ, বিকলাঙ্গ ও স্বল্পায়ুঃ হয়। অশোক ষষ্ঠী ব্রতের সন্তানকল্যাণের আবেদনটি স্বাস্থ্যনৈতিক দিক থেকে খুবই সুস্পষ্ট।

ষষ্ঠীপর্ব্বের শেষ পর্য্যায়ের কথা। নীলষষ্ঠীর ব্রত বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ। এ ব্রতের নিয়ম এই—এক মাস ধ'রে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে পূর্ণ সংযম পালন ক'রে প্রত্যহ শিবের পূজা করতে হয়, সংক্রান্তির দিন নীলাবতীর পূজা ও নীলকণ্ঠ শিবের মন্দিরে প্রদীপ দান ও ষষ্ঠীর আরাধনা বিধেয়। এ ব্রত ক'রে জনৈকা মৃতবৎসা ব্রাহ্মণী জীববৎসা হয়েছিলেন। ব্রতপূজা তিনি আগেও বহু করেছিলেন, কিন্তু তবু পাঁচটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে হারাতে হয়। "ব্রত-পূজা সবই মিথ্যা", এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাসী হন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক দিন গঙ্গার ঘাটে বসে কাঁদছিলেন। সেই সময় মা ষষ্ঠীর দয়া হয়। তিনি বৃদ্ধার বেশে এসে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপনছলে তাদের বক্তব্য শুনে নিয়ে পরে বলেন—"তোমরা ব্রতপূজা বহু করেছিলে ঠিক, কিন্তু সবই অহঙ্কার বুদ্ধিতে করেছ। অহঙ্কার বুদ্ধিতে করলে ব্রতপূজার ফল হয় না। নিরভিমান চিত্তে, ঠাকুর-দেবতার প্রতি শুদ্ধা ভক্তি রেখে ব্রতপূজা করতে হয়।"

দেবী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মাণীকে নীলষষ্ঠীর ব্রতের উপদেশ দেন। উভয়ে বাড়ী

ফিরে এসে ভক্তিভাবে এবং অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়ে উক্ত ব্রত সম্পাদন পূর্ব্বক সফলকাম হন। ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অহঙ্কার বিসর্জ্জনের কথাটি মনে রাখলে আমাদেরও পরম মঙ্গল। অহংবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ। অহঙ্কার ত্যাগেই আত্মিক মুক্তির পথ হয় সরল।

চণ্ডীপর্ব্ব

চণ্ডীর পূজা কুমারীব্রতকল্পে আমরা দেখেছি। কিন্তু, সধবাব্রতকল্পে মঙ্গল চণ্ডীর আরাধনার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। সন্তানের কল্যাণ ভাবনার সহিত সংসারের সর্ব্বাত্মক শুভ লাভের কামনাতেই মঙ্গলচণ্ডীব্রত উদ্‌যাপিত। দেবীর কৃপা হ'লে জীবনের সমুদয় অভীষ্টই পূর্ণ হতে পারে, তিনি বিমুখা হলে সমূহ অকল্যাণ !

মঙ্গলচণ্ডীব্রতের নানা রূপ আছে, তা পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, নানা রূপ থাকা সত্ত্বেও বারমেসে ব্রতের জন্য এক সাধারণ পদ্ধতি আছে। বারমেসে ব্রতকথার মাহাত্ম্যও অতি চমৎকার। ধনপতি সদাগরের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র শ্রীমন্ত দেবীর কৃপায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহলে গিয়েছিল এবং সিংহলরাজকে কমলে কামিনী দর্শন করিয়ে তুষ্ট ক'রে বন্দী পিতাকে মুক্ত ক'রে এনেছিল এবং সিংহলরাজকন্যা সুশীলাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিল। দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত জলে ডুবে নি, ঝড়ে বিনষ্ট হয় নি, রাজরোষেও মরে নি। ঠিক যেন ধ্রুব-প্রহ্লাদের চরিত্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এই শ্রীমন্তের চরিত্র নিয়েই তাঁর বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

বৈশাখ মাসে হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত। এই ব্রতের মাহাত্ম্য এই, যিনি এ ব্রত করেন চির জীবন তাঁর হরিষে কাটে, কখনো দুঃখে তাঁর চোখের জল পড়ে না। কোনও ব্রাহ্মণীর মুখে ব্রতমাহাত্ম্য শুনে এক গয়লানী এ ব্রত করে। তাতে দরিদ্র্য গয়লানীর প্রচুর সুখ ও সম্পৎ হয়। এত সুখ যে গয়লানী যেন মহা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এমন তো হয়। কোনও মেছুনির ফুল বাগানে ফুলের গন্ধে ঘুম হয়নি। অভ্যস্ত পূতি গন্ধে ঘুমের সুবিধের জন্য সে মাছের শুকনো চুবড়িটা জলে ভিজিয়ে মাথার কাছে রেখেছিল। গয়লানীরও যেন সেই অবস্থা। চরম দুঃখের পর পরম সুখ যেন তার অসহ্য। সে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারাগার থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি চায়, সে একটু কাঁদতে চায়। কিন্তু, এ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, সে হরিষ মঙ্গল ব্রতের অনুষ্ঠান করে। সুতরাং, তার দুঃখ তো হতে পারে না। তবু পীড়াপীড়িতে ব্রাহ্মণী বলেন—"ওদের বাড়ীর জ্যান্ত লাউ গাছটা কেটে দাও, ওরা গালি দেবে, তখন কেঁদো।" কিন্তু, লাউগাছে হাত দেওয়া মাত্র গাছটা আরও সতেজ হয়ে

উঠে। সুতরাং, গয়লানীর কান্না আর হয় না। দ্বিতীয় বারে গয়লানী একটা মরা হাতীর গলা ধ'রে কাঁদতে গেল। কিন্তু, হাতীটা তার পূত স্পর্শে বেঁচে উঠে। তৃতীয় বারে গয়লানী নিজ কন্যার বাড়ীতেই বিষের নাড়ু পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু, চণ্ডীর প্রসাদে বিষ পরিণত হয় অমৃতে। কন্যা-জামাতা নাড়ু খেয়ে ভারী খুসী। ক্রন্দনের এ চেষ্টাও ব্যর্থ। গয়লানী কেবলই উত্যক্ত করে ব্রাহ্মণীকে —একটু কাঁদবার উপায় সে ব'লে দিক। ব্রাহ্মণী বিরক্ত হয়ে বলেন—"তবে চণ্ডীর ব্রত ছেড়ে দাও।" গয়লানী অজ্ঞতাবশতঃ কাঁদবার সখে তা-ই করে। ফলে তার কপাল আবার ভাঙ্গে। চণ্ডীর কৃপায় ধন-জন, সুখ-ঐশ্বর্য্য যা পেয়েছিল, সব যায়। অভাগী কাঁদতে চেয়েছিল, খুব কেঁদে নিল। ব্রাহ্মণী বলেন—"হয়েছে তো ? আবার হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর, সব ফিরে পাবি।"

জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথার নায়ক-নায়িকা যথাক্রমে জয়দেব ও জয়াবতী। দু'জনেরই জন্ম মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদে। একবার জয়দেবের একটা পোষা পায়রা চণ্ডীর ব্রতদাসী জয়াবতীর কোলে এসে পড়ে। জয়দেব পায়রাটা খুঁজতে খুঁজতে জয়াবতীর সমীপবর্ত্তী। জয়াবতী তখন মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছিল। জয়দেব পায়রাটা দাবী করে। জয়াবতী দিতে চায় না। জয়দেব বলে—"যদি আমার পায়রা না দাও, তবে তোমাদের এ সব খেলা ভেঙ্গে দেবো।" জয়াবতী বলে—"সে কি ? এ যে আমরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছি, ভেঙ্গে দেবে কেন ?" জয়দেব জান্‌তে চাইলো ব্রতের কি ফল। জয়াবতী উত্তরে ব্রতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে বলে—"এ ব্রত করলে কখনো দুঃখ থাকে না, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, খাঁড়ায় কাটে না, হারালে পায়, মরে গেলে বেঁচে উঠে।" "তাই না কি ? আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাবে।"—মনে মনে এরূপ চিন্তা ক'রে পায়রাটা নিয়ে জয়দেব চলে যায়। কিন্তু, ভুলতে পারে না সে জয়াবতীর সুন্দর মুখখানি, আর ঐ ব্রতফলের পরীক্ষার কথা।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে জয়দেব তার মাকে জানায় যে, সে জয়াবতীকেই বিবাহ করতে ইচ্ছুক। এদিকে দেবী চণ্ডী জয়াবতীর পিতাকেও স্বপ্নে আদেশ করেন জয়দেবের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিতে। সুতরাং, বিবাহে কোন বাধা থাকে না। শুভ দিনে শুভক্ষণে মহাড়ম্বরে বিবাহানুষ্ঠান হয়ে যায়। এবার চণ্ডীব্রতের ফলাফলের পরীক্ষা। জয়দেব বার বার পরীক্ষা নেয়। কিন্তু, চণ্ডীর ব্রতদাসী জয়াবতী প্রতি বারেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। প্রথম বারে জয়দেব জয়াবতীর অজ্ঞাতসারে তার গহনাগুলি নিয়ে পুটলী বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। কিন্তু, ঐ পুটলিটা একটা বোয়াল মাছে গিলে খায়। দেবীর ইচ্ছায় ঐ মাছটা ধরা পড়ে ক্রীত হয়ে আবার জয়দেবের বাড়ীতেই আসে। জয়াবতী মাছটা কুটতে গিয়ে নিজের গহনাগুলি অনায়াসে উদ্ধার

করে। এর পর নিজের ছেলেকেই আগুনে ফেলে, জলে ডুবিয়ে, অস্ত্রে ছেদন ক'রে জয়দেব দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরীক্ষা নেয়। কিন্তু, প্রতিবারেই মঙ্গলচণ্ডীর করুণার জয় ঘোষণা ক'রে সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়। জয়দেবের সন্দেহ দূরীভূত। অবশিষ্ট জীবন দু'জনে চণ্ডীর শরণাগত হয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করে। অন্তিমে তাদের উভয়ের স্বর্গলাভ।

অগ্রহায়ণ মাসে কুলুই চণ্ডীর ব্রত। এ ব্রত করলে কুলে কখনো কলঙ্ক হয় না। মঙ্গল বারে গৃহের আঙিনায় আলপনা দিয়ে কুলের ডাল রোপণ ক'রে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসাতে হয়। এ ব্রতের উপকরণ—জোড়া কলা, জোড়া কুল, চিড়ে পাটালী গুড় আর ধান্যদূর্ব্বাদির অর্ঘ্য। ব্রতে আকুলী-সুকুলীর উপাখ্যান শুনতে হয়।

আকুলী-সুকুলীর জন্ম এক অনূঢ়াব্রাহ্মণ কুমারীর গর্ভে। ঠাকুর ঘরের একটা জোড়া কলা খেয়ে সে গর্ভবতী হ'লে তার পিতামাতা লোকলজ্জা ভয়ে কন্যাকে বনে নির্ব্বাসিত করে। আসলে মেয়ে তো আর ভ্রষ্টচরিত্রা নয়, এটা নেহাৎ দৈব ঘটনা। জোড়া কলা খেলে এমনটি হবে তা কি সে জান্‌তো! নিরপরাধা হয়েও সে আজ কুলকলঙ্কিনী। দেবী তার কৃপার মহিমা জগতে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরবেন বলেই নিজ সেবাদাসীকে এই পরীক্ষাসাগরে নিক্ষেপ করেছেন।

বনে নির্ব্বাসিতা ্রাহ্মণকুমারী যমজ পুত্র প্রসব করে। কান্তারবাসিনী দেবী বৃদ্ধার বেশে সেই বনে বিচরণকালে সেই কুমারী ও তার পুত্রদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম আকুলী-সুকুলী। বনের ভিতর ওদের আপন বলতে তো আর কেউ নেই। বৃদ্ধারূপিণী দেবীই ওদের সব—ওদের দিদিমা। দিদিমার আসল স্বরূপ ওরা জানে না, কিন্তু তাঁর অলৌকিক মহিমার নিদর্শন নিরন্তর পায়।

একদিন ওরা খেলা করছে। দেখ্‌লে এক সদাগর সাত ডিঙ্গা ধন নিয়ে গৃহে ফিরে চলেছে। নৌকো দেখে বালকদ্বয় ছুটে যায়। সদাগরকে ডেকে বলে—"কি আছে তোমার ডিঙগায়? খাবার আছে? আমাদের কিছু খেতে দাও না, বড় ক্ষুধার্ত্ত আমরা।" বেনে বলে—"ডিঙগায় আমাদের খাবার-টাবার কিছু নেই, সব লতাপাতা।" "তাই হোক" বালকদ্বয়ের উক্তি। কিন্তু, সদাগর বিস্মিত হয়ে দেখে সত্যই ধন-রত্ন সব লতাপাতায় পরিণত। বালকদ্বয় সামান্য নয় ভেবে সদাগর উভয়ের পা জড়িয়ে ধরে। ওরা বলে—"আমরা তো কারো ভাল বা মন্দ করতে জানিনে, তবে আমাদের দিদিমা সকলের ভালো করেন।" বালকদ্বয় সদাগরকে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে নিয়ে যায়। দেবী বলেন—"এ বালকদ্বয় আমার সেবাদাস। তুই তাদের অপমান করেছিস্!

যা, ঘরে গিয়ে কুলুই চণ্ডীর ব্রত কর, সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে।" সদাগর তা-ই করে। তার ডিঙগা আবার ধন-রত্নে ভরে উঠে।

কিন্তু, দেবীর কর্ত্তব্য এখনো অসমাপ্ত। নিজ সেবাদাসীর কলঙ্কভঞ্জন ক'রে তাকে পুনঃ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর তাঁর সন্তান দু'টিরও সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেবী আকুলী-সুকুলী এবং তাদের গর্ভধারিণীকে নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ী আসেন এবং কুমারীর যে কোনও দোষ নেই, শুধু মঙগলবারে জোড়া কলা খেয়েই তার যমজ সন্তান হয়েছে, সে ঘটনা বলেন। তিনি আরো পরিচয় দেন—আকুলী-সুকুলী তাঁরই ব্রতদাস, এদের অবমাননা যে করবে তার সর্ব্বনাশ হবে। ব'লেই দেবী অন্তর্হিতা। দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই দেশের রাজা তার পুত্রের সঙেগ ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ দেন। ব্রাহ্মণের কুলকলঙ্কই শুধু মোচন হয় না, দেবীর কৃপায় রাজকুলের সহিত তার আত্মীয়তার সম্বন্ধও স্থাপিত হয়।

কুমারী কন্যাদের নিয়ে মাঝে মাঝে গৃহীদের কিরূপ বিব্রত হতে হয়, কুলুই চণ্ডীর ব্রতকথায় আমরা তা দেখি। আমাদের ঘরের কীর্ত্তিমান্ পুত্র সন্তানদের আত্মবিস্মৃতির ফলেও সংসারে কম অশান্তি আসে না। কোন সদাগর দীর্ঘকাল পর ঘরে ফিরে এসে তার নিজের স্ত্রীকে চিন্‌তে পারেন না। ঘরের দাসীকে নিয়ে ঘর করতে আরম্ভ করেন। প্রবাস থেকে যা কিছু বস্ত্রালঙ্কার এনেছিলেন, সব দিয়ে দাসীকেই সাজান। সদাগরের মা বধূমাতার দুঃখে বড় কাতরা। এক প্রতিবেশিনীর উপদেশে বউকে দিয়ে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করান। দেবীর কৃপায় সদাগরের মতিগতি ফিরে যায়।

সদাগর-বধূ খেদ ক'রে বলে—

> হাতের কঙ্কণ বেচে কিন্‌লুম দাসী,
> সে হল রাজমহিষী।
> আমি হলুম দাসীর দাসী ॥

সদাগর নিজের ভুল বুঝে সহধর্ম্মিণীকে আদর ক'রে ঘরে নিয়ে যান। পত্নী যদি যথার্থ ধর্ম্মশীলা ও সাধ্বী হয়, তবে তার পুণ্য ফলে সংসারের কঠিনতর সঙ্কটও দূরীভূত হতে পারে। এ ব্রতের নিয়ম এই—দু'জন এয়ো ব্রতাচরণ ক'রে এক সঙ্গে খেতে বস্‌বে। খাওয়ার সময় কথা বল্‌বে না। খাওয়া শেষ হ'লে দুজনেই দু'জনকে বল্‌বে—"সঙ্কট থেকে উঠি।" উভয়েই বল্‌বে—"উঠ।" এ ব্রতের কিছু ত্রুটি হওয়াতেই সদাগরবধূকে পতিসুখে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বার শাশুড়ীর আদেশে ও প্রতিবেশিনীর পরামর্শে নিখুঁত ভাবে ব্রতাচরণ ক'রে সে পুনঃ স্বামীর ভালবাসা ফিরে পায়। পতিসুখবিমুখ হওয়া নারীজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সঙ্কট। এরূপ সঙ্কট যদি

কা'রো জীবনে আসে, তবে সঙ্কটহারিণী দেবীর শরণাগতিই তার পরিত্রাণের সর্ব্বোত্তম উপায়।

সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে সদাগরপত্নী তার স্বামীকে নিজের কাছে ফিরে পেয়েছিলেন, আর সঙ্কটার ব্রত ক'রে কোনও রাজমহিষী তাঁর সন্তানকে এক কাপালীর রক্তপিপাসা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। গল্পটি বেশ সুন্দর। তবে সংক্ষেপেই বল্‌তে হবে।

কোনও দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সাত রাণী। কিন্তু, সকলেই বন্ধ্যা। রাজাকে সকলেই আঁটকুড়ো ব'লে আড়ালে নিন্দা করে, এমন কি রাজবাড়ীর ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত। রাজার মনে বড় বেদনা। তিনি ঠিক করেন এ পোড়ামুখ আর কাউকে দেখাবেন না। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করেন।

ঠিক এমনি সময় এক কাপালী সন্ন্যাসী এসে রাজগৃহে উপস্থিত। সন্ন্যাসী রাজার হাতে কিছু ঔষধি দিয়ে বলেন, "সকল রাণী যেন এ ওষধি বেটে খায়, তবেই সন্তান হবে।" তবে শর্ত্ত রইলো এই, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলেটিকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করতে হবে। ছ'রাণী ওষধি খায় আর ছোট রাণী খায় ওষধি বাটার শিল্‌নোড়া ধোয়া জল। সকলেই অন্তঃসত্ত্বা। যথা সময়ে ছ' রাণী ছ'টি টুক্‌টুকে ছেলে প্রসব করে, আর ছোট রাণী প্রসব করে একটা শঙ্খ। অতএব, রাজা ছোট রাণীকে বড় পছন্দ করেন না। তার স্থান হলো এক উপেক্ষিত পর্ণকুটীরে।

রাণী শঙ্খটি নিয়েই কুটীরে থাকেন। কিন্তু, নিদ্রাঘোরে তার আশ্চর্য্য অনুভূতি—কে যেন তাঁর স্তন্য পান ক'রে চলে যায়। এ কি স্বপ্ন? না, বাস্তব সত্য? পরীক্ষার জন্য রাণী এক দিন ঘুমান না, শুধু ঘুমের ভান করে জেগে থাকেন। গভীর রাত্রে দেখেন, এক সোনার চাঁদ ছেলে শঙ্খ থেকে নির্গত হয়ে রাণীর স্তন্য পান করছে। আর যায় কোথা! রাণী দু'টি পিপাসিত বাহু দিয়ে সন্তানকে স্নেহডোরে বেঁধে ফেলেন, আর শঙ্খটি ফেলেন ভেঙ্গে। বলেন—"আর তোকে যেতে দেবো না।" শিশুটি বলে—"মা, এ তুমি কি করলে? আমাকে যে সেই সন্ন্যাসী নিয়ে যাবে।" পর দিন রাণী শিশুটিকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে সব কথা জানাতে তিনি খুব খুসী। ছেলের নাম রাখা হয় শঙ্খনাথ।

বার বৎসর পর সন্ন্যাসী পুনঃ উপস্থিত। রাজাকে বলেন—"কই, আমার ছেলে দাও।" রাজা শঙ্খনাথকে গোপন রেখে অন্য ছ'টি রাজপুত্রকে দেখান। কিন্তু, সন্ন্যাসী জানেন—এ ছ'টি রাজপুত্রের কাউকে দিয়ে তাঁর প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রয়োজন শঙ্খনাথকে। রাজার ছলনা বুঝে সন্ন্যাসী শঙ্খে ফুৎকার দিয়ে

ডাকেন—"কৈ, আমার শঙ্খনাথ কৈ?" শঙ্খধ্বনি শুনেই শঙ্খনাথ রাজপুরী থেকে বেরিয়ে আসে। সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে প্রস্থান করেন। রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল। বিশেষতঃ ছোট রাণী পুত্রশোকে মূর্চ্ছিতপ্রায়। কিন্তু উপায় কি? শঙ্খনাথকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না! এক প্রবীণা রমণী সব দেখে শুনে ছোট রাণীকে বলেন—"মা, এক উপায় আছে, তুমি সঙ্কটার ব্রত কর, তা হলে ছেলে ঘরে ফিরে পাবে।" পুত্রস্নেহাতুরা রাণী ভক্তিযুক্ত হয়ে ব্রত করেন এবং কাতর ভাবে দেবীর কাছে প্রাণের আর্ত্তি জানান। ফলে সহসা পট পরিবর্ত্তিত। একদিন দেখা গেল—রাজকন্যা বিয়ে ক'রে শঙ্খনাথ রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছে। ঐ কাপালী সন্ন্যাসী তাকে মা কালীর কাছে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। শঙ্খনাথ কৌশলে সন্ন্যাসীকেই খড়্গ সহায়ে মায়ের কাছে বলি দিয়েছে এবং ১০৭ জন রাজা, যাঁদিগকে কাপালী পূর্ব্বে বলি দিয়েছিল, দেবীর নির্ম্মাল্য স্পর্শে তাঁদের জীবন দান করেছে।

পৌষ সংক্রান্তিতে সোদোর ব্রত। "সোদো" অর্থে "সুয়ো-দুয়ো।" এ ব্রতের উপাস্যাও মঙ্গলচণ্ডী। এ ব্রতের এমনি মহিমা যে তাতে দস্যু এবং দুষ্কৃতকারীও সাধুতে পরিণত হয়। দুষ্টু সাধুতে রূপান্তরিত হয় ব'লেই এ ব্রতের নাম "সুয়ো-দুয়ো" কি না তা বিচার্য্য। রামনামের অপার মহিমায় দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ কাহিনী আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি। আর চণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে একদল দস্যু শুভ মতি লাভ করেছিল, "সুয়ো-দুয়োর" ব্রতকথায় আমরা তা ভক্তি সহকারে শুনি। গল্পটি এই :—

এক সদাগরের সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটা থাক্‌তো পিসির বাড়ী। পিসি তাকে এক দস্যুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে মেয়েটা আর বাপের বাড়ী আসে নি। বাপ-মাও তার আর কোন খোঁজ নেন নি। কিছু দিন পর সদাগর যায় মরে, ছেলেরাই হয় সংসারের কর্ত্তা। পিতার পন্থা অনুসরণ ক'রে এক দিন তারা বেরুলো বাণিজ্যে, সাত ডিঙ্গা ধন-রত্ন ও বাণিজ্যোপকরণ নিয়ে।

পথে তাদের পাঁচ মাস কেটে যায়। এক দিন তারা এক ডাকাতের অতিথি। এ বাড়ীতেই যে ওদের ভগ্নীর বিয়ে হয়েছে, তা ওরা জানে না। দস্যুদের দেওয়া ভিজে কাঠ দিয়ে ভিজে উনুনে যখন সাত ভাই রান্না করছে, তখন এক সুন্দরী বউ এসে ওদের সাবধান ক'রে দেয়। পরিচয়ে জানা যায়, এ বউটিই ওদের বোন। দস্যুরা লুণ্ঠনবৃত্তির ক্ষেত্রে শ্যালক-শ্বশুরকেও অব্যাহতি দেয় না। সুতরাং, সাত ভাই সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য ব'লে মনে করে। দস্যুদের মাও ছিল খুব দয়াবতী। সেও সাত ভাইকে পলায়নে সাহায্য করে। সাত ভাইএর বিধবা মা। ছেলেরা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গেলে তিনি পরম

শ্রদ্ধা সহকারে সন্তানগণের কল্যাণের জন্য "সুয়ো-দুয়ো"র ব্রত সম্পাদন করতেন। তাতেই দস্যুর হস্ত থেকে নিস্তার পেয়ে তারা নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

গৃহে ফিরে দস্যুগৃহে বসবাসকারিণী ভগিনীর কথা কিন্তু ওরা ভুলে নি। ওদের এক ভগিনী ছিল, দস্যুর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে—মায়ের কাছ থেকেও এ ঘটনা জেনে সাত ভাই সিদ্ধান্ত করে—ভগিনীকে পিত্রালয়ে আন্‌তে হবে। ভগিনী এবং ভগিনীপতি উভয়কে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়, ভগিনীপতির অন্য চার ভাইকে এবং ভগিনীর বৃদ্ধা শাশুড়ীকেও। দস্যি জামাই শ্বশুরালয়ে এসে শাশুড়ী এবং শ্যালকদের প্রচুর সমাদর লাভ করে এবং বিদায় কালে পায় প্রচুর যৌতুক। এ গৃহের ধর্ম্মীয় পরিবেশে বোধ হয় দস্যুদের মনের পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, বোধ হয় তাদের অনুতাপ এসেছিল। বিদায় কালে জামাতা এবং তার অন্য চার ভাই শাশুড়ীর কাছে অকপটে স্বীকার করে তাদের অপকার্য্যের কথা, কেমন ক'রে তাদের পাপ খণ্ডন হবে, তাও তারা জান্‌তে চায়। শাশুড়ী বলেন—"তোমরা মকর সংক্রান্তির দিন সুয়ো-দুয়োর ব্রত কোরো। তাতেই তোমাদের পাপ খণ্ডন হবে, মতিগতি ফিরবে।" দস্যুরা বাড়ী গিয়ে তা করে। ফলে তারা ভাল হয়ে যায়। আর দস্যুবৃত্তি করে নি।

নিয়মিত ব্রতপূজাদির মধ্য দিয়ে শুধু যে কেবল সৌভাগ্য, আরোগ্য, পুত্র-কলত্র, সুখ-সমৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ হয় তা-ই নয়, এ উপায়ে ঘোর দুষ্কৃতকারীর চারিত্রিক পরিবর্ত্তনও ঘটতে পারে এবং ঘ'টে থাকেও। পুণ্যানুষ্ঠানের মহিমা এমনি।

লক্ষ্মীপর্ব্ব

হিন্দুঘরের শ্রীমতিদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা যে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানটি অধিক সমাদর লাভ করেছে, সে-টি হলো লক্ষ্মীব্রত। কেবল গৃহ-সংসারকে সুখে, সম্পদে, সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ ক'রে তুলার জন্যই নয়, তাঁরা নিজেরাও হতে চান লক্ষ্মীস্বরূপিণী, এ জন্যই লক্ষ্মীব্রত উদ্‌যাপনে তাঁদের এত ভক্তি ও আগ্রহ। তাঁদের কন্যা ও পুত্রবধূরা লক্ষ্মীর মত সুশীলা ও শ্রীসম্পন্না হোক, এও তাঁদের প্রাণের ঐকান্তিকী কামনা। এমন কোন ধর্ম্মশীলা গৃহিণী বোধ হয় কমই আছেন, যিনি ঘরে লক্ষ্মীর আসন পেতে তাঁর সেবা-ভক্তি না করেন। আমরা জানি, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত যেমন মঙ্গলবারে, লক্ষ্মীর ব্রত তেমনি প্রতি বৃহস্পতি বারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের আরো জানা, লক্ষ্মীব্রতের জন্য বিভিন্ন মাসের উপযোগী বিভিন্ন "কথা" বা উপাখ্যান প্রচলিত। দেবী লক্ষ্মীর অপার করুণায় কি ভাবে অতি দুর্ভাগাও সৌভাগ্যশালী হয়েছে, নির্ধন ধনলাভ করেছে, ব্রতোপাখ্যানগুলির ভিতর সে কথাই আমরা জানতে পারি। ধনদেবী লক্ষ্মীর অলৌকিক মহিমা প্রচারই ব্রতোপাখ্যান সমুদয়ের মূল উদ্দেশ্য। সংসারে সৌভাগ্য সুখ ও শীল লাভের ব্যাবহারিক সাধনা কি, তার সূচনা

ব্রতকথার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীব্রতের ব্রতিনী জানেন—দু'বেলা বাড়ীতে ছড়া ঝাঁট ধুনো গঙ্গাজল দিতে হয়, অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুতে নেই, চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে হয়, উদ্ধত ভাবে চলতে নেই, কলহ করতে নেই, নখে ক'রে কুটো ছিঁড়বে না, সব সময় নেই নেই করবে না, শুদ্ধ আচারে চল্‌বে, তা হলেই লক্ষ্মী অচলা থাক্‌বেন ঘরে।

মা লক্ষ্মীর বাহন পেচক। এই পেচকের কল্যাণে কোনও দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর ছেলে গোলোকে স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণের নিকট পৌছে 'তিল ধুবড়ি' চেয়ে নিয়েছিল। সেই তিল ধুবড়ি পূজা করে তাদের ধন-দৌলত, হাতী-ঘোড়া, টাকা-কড়ি সব হয়েছিল। এমন কি, সেই দেশের রাজা তার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণীর ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ওদের এত দুঃখ ছিল যে ক্ষীর খাওয়ার জন্য একটি মাত্র পয়সা চাইলেও ব্রাহ্মণী তার ছেলেকে তা দিতে পারে নি। মাত্র চার কড়া কড়ি দিতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণীর ছেলে সেই চার কড়া কড়িতে ক্ষীর কিনে একা খায় নি। সম্মুখে এক অশ্বত্থ গাছের কোটরে দু'টো পেচকের ছানা ছিল, তাদের পেট ভরে খাইয়ে অবশিষ্ট যা ছিল তাই খেয়েছিল। এ ভাবে রোজই সে পেচকের ছানা দু'টিকে খাওয়াতো। পেচক ছানারা তাদের বাপ মাকে বলে—"এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীর ছেলেটি রোজ রোজ আমাদের এত খাওয়ায়, আর তোমরা ওদের জন্য কিছু করতে পার না? সত্যিই ওদের খুব দুঃখ।" পেচক-পেচকী বলে—"আচ্ছা, তার জন্য তোদের কিছু ভাবতে হবে না।" অবশেষে একদিন পেচকের পিঠে চড়ে ব্রাহ্মণীর ছেলে গোলোকে গিয়ে উপস্থিত। মা লক্ষ্মী ধন-দৌলত অনেক কিছু দিতে চান। কিন্তু ব্রাহ্মণীর ছেলে পেচক-পেচকীর পরামর্শ মত সে সব কিছু নেয় না—তিলধুবড়ি চেয়ে নেয় এবং ওতেই ওদের ভাগ্য ফিরে যায়।

ভাদ্র মাসের প্রাগুক্ত ব্রতকথায় দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর ছেলের চরিত্রে কিছুটা স্বার্থত্যাগ ও ইতর জীবের প্রতি করুণা ও সেবার আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বার্থত্যাগ ও জীবসেবার আদর্শ যাঁর আছে, ধনৈশ্বর্য্যের যথার্থ সদুপযোগ তাঁর হাতেই সম্ভব। এইরূপ ব্যক্তি ধনবান্‌ হ'লে দেশ ও সমাজের পরম মঙ্গল।

আশ্বিনী পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। কোনও রাজমহিষী এই পূর্ণিমায় ঋষিকন্যাদের সঙ্গে লক্ষ্মীর ব্রত, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ ক'রে রাজার অনুকূলে লুপ্ত রাজ্যসম্পৎ উদ্ধার করেছিলেন। গল্পটি এই ঃ

কোনও দেশে এক দয়ালু, ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি ঘোষণা ক'রে দেন, রাজধানীর বাজারে দেশ-বিদেশ হ'তে যে সকল জিনিস বিক্রয়ার্থে আসবে তার মধ্যে কোনটা যদি বিক্রয় না হয় তবে রাজা নিজেই

তা কিনে নেবেন। প্রজার কল্যাণেই রাজার এই ঘোষণা। কিন্তু, এই ছিদ্রপথেই অলক্ষ্মী তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করে। ভিন্ন দেশ থেকে এক ব্যবসায়ী একটা লৌহময়ী অলক্ষ্মী মূর্ত্তি বিক্রি করতে এনেছিল। কেউ তা কিনে না। শেষে রাজাই তা কিনে নেন।

গভীর রজনী। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় রাজা দেখেন, এক পরমা সুন্দরী রমণী কাঁদছেন। পরদুঃখকাতর রাজা শুধালেন—"কে মা তুমি, কাঁদছো কেন?" রমণী বলেন—"আমি তোমার রাজলক্ষ্মী। তোমার রাজ্য থেকে আমাকে চলে যেতে হবে, তাই কাঁদছি। তুমি অলক্ষ্মী কিনেছ, তাই আমার এখানে থাকা চল্‌বে না।" দেবী অনুকম্পাবশতঃ পরে বলেন—"তবে যাবার আগে তোমায় বর দিয়ে যাচ্ছি, তুমি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পারবে।" ব'লেই রাজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিতা। দুশ্চিন্তায় রাজার সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। কিন্তু, তথাপি তিনি অবিচলিত।

তার পর দিন ভাগলক্ষ্মী ও যশোলক্ষ্মী চলে যান। তৃতীয় দিনে রাজা দেখেন, এক জন পুরুষ ও এক জন নারী রাজপুরী থেকে চলে যাচ্ছেন। পরিচয়ে রাজা অবগত হন, পুরুষটি হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, আর নারীটি হচ্ছেন কুললক্ষ্মী। রাজা কুললক্ষ্মীকে কোন বাধা দেন না, কিন্তু ধর্ম্মরাজের গমনে আপত্তি জানান। বলেন—"ধর্ম্মরাজ! আপনি তো যেতে পারেন না। আপনি জানেন, আমার কোন দোষ নেই, আমি প্রজারক্ষণার্থেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে, যার কোন জিনিস বিক্রয় হবে না তা আমিই কিনে নেব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থেই অলক্ষ্মী কিনেছিলাম! আমি তো ধর্ম্ম ত্যাগ করি নি, করবোও না। রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারবো না। আপনার যাওয়া হবে না।" রাজার যুক্তিযুক্ত বচনে ধর্ম্মরাজ বাঁধা পড়ে যান। কুললক্ষ্মীর বিদায়। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যেতে পারেন না। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও কুলের চেয়েও ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই তো ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী। জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায়ও যদি মানুষ ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, তবে শত দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও পরিণামে তার জয় সুনিশ্চিত। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—অষ্টাদশ পর্ব্ব-সমন্বিত বিরাট মহাভারত থেকে সুরু ক'রে ছোট্ট এক ব্রতকথার মধ্যেও এই পরম সত্যই ভারতে নিত্য প্রচারিত।

যাক্, রাজার গল্পটাই বলি। রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মী বিদায় গ্রহণের পর রাজার দুরবস্থা কি হ'তে পারে তা আর ভেঙ্গে না বল্‌লেও চলে। রাজা ক্রমশঃ হতশ্রী হতভাগ্য হ'তে হ'তে অবশেষে এমন পর্য্যায়ে এসে উপনীত যে, রাজভোগ তো দূরের কথা, অন্নের সঙ্গে সামান্য ঘৃতও জোটাতে পারেন না। রাজার ভোজন কালে পিঁপড়েগুলো পর্য্যন্ত সেই কথা বলাবলি

করে। পিঁপড়ের মুখেও নিজের দুরবস্থার কথা শুনে রাজ্যলক্ষ্মীর বরে পরভাষামর্ম্মজ্ঞ রাজা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেন।

"হাসলেন কেন? বলুন।"—রাণীর প্রশ্ন। রাজা বলেন যে, তা বলা যাবে না, বল্‌লে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। তবু রাণীর আবদার—"বলতেই হবে।" উভয়ে মিলে যান নদীর তীরে। সেখানেও রাণীর সেই জেদ্‌। রাজার মৃত্যু হ'বে জেনেও রাণী নাছোড়-বান্দা। রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যখন চিন্তা-পরায়ণ, তখন অকস্মাৎ এক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে রাজার চৈতন্য হয়। এক ছাগী নদীর জলে ভাসমান এক গুচ্ছ তৃণকে লক্ষ্য ক'রে ছাগকে বল্‌ছে—"ঐ তৃণ আমাকে এনে দাও, আমি খাব।" ছাগ উত্তর দিলে যে, সে তো আর রাজার মত বোকা নয় যে, স্ত্রীর কথায় জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেবে। শুনেই রাজা যেন একটা পথ খুঁজে পান। হয়তো অলক্ষ্মীর প্রভাবও অলক্ষ্যে কাজ করছিল। ফলে রাজা কোনও এক সুযোগে রাণীকে বনে বিসর্জ্জন দিয়ে দুঃখিত অন্তরে রাজধানীতে একাকী চলে যান। সত্য সত্যই রাজা নদীতীরে আজ নিজ কুললক্ষ্মীকেও বিসর্জ্জন দেন। কিন্তু, এর ফল শেষ পর্য্যন্ত ভালই হয়!

একাকিনী রাণী বনচারিণী। ক্রমে আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথি সমাগত। ঋষিকন্যারা অরণ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীব্রত আরম্ভ করেছেন। রাণী ব্রতমাহাত্ম্য শুনেন। তাঁরও ইচ্ছা হয় ব্রত করবেন—রাজ্যের কল্যাণে, পতির কল্যাণে, নিজের কল্যাণে। ব্রতের যেমন যেমন বিধান, সবই তিনি প্রতিপালন করেন। কোজাগরী লক্ষ্মীব্রতের এমনি মাহাত্ম্য যে, বনে রাণী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া মাত্রই রাজ্য থেকে অলক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করে। পূর্ণিমা রাত্রির অবসানেই আশ্চর্য্য হয়ে রাজা দেখেন, তাঁর রাজ্য যেমন ছিল, ঠিক তেমনি হয়ে গেছে। রাণীর ব্রতানুষ্ঠানেই এরূপ হয়েছে অবগত হয়ে রাজা তাঁকে সমাদরে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে আসেন। রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং রাণীর ব্রতনিষ্ঠায় রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী সকলেই একে একে প্রত্যাগতা।

মানুষের ভাগ্যবিধাতা কে? মানুষ? না, ভাগ্যবিধাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী?—এ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে কার্ত্তিক মাসের ব্রতকথার শিক্ষার মাধ্যমে। কোনও রাজার অহঙ্কার ছিল, তার ভাগ্যেই সকলে খায়, বিশেষতঃ তাঁর পাঁচটি কন্যা। পিতার মনস্তুষ্টির জন্য প্রথম চারিটি কন্যা সে কথাই স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা স্বীকার করে না। তার অভিমত—কা'রো ভাগ্যে কেউ খায় না, মা লক্ষ্মীই সকলকে খাওয়ান, মানুষ মাত্রেই নিজের ভাগ্যে খায়। বিরক্ত রাজা পর দিন সকালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে বলেন—"যাও, এবার নিজের ভাগ্যে খাওগে।" রাজকন্যা হাসিমুখেই পিতাকে প্রণাম জানিয়ে স্বামীর হাত ধ'রে দারিদ্র্যপীড়িতের পর্ণকুটীরে চলে যায়।

রাজার মেয়ে দরিদ্রের ঘরে। কিন্তু, তাতে তার নেই বিন্দু মাত্র ক্ষোভ। কেন না, এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাকে দুঃখ-দারিদ্র্যে অবিচলিত থাকতে অসীম শক্তি দেয়। সে নীরবে তার গৃহিণীর ধর্ম্ম পালন করে। কষ্টের সংসারে সে নিজেই ঝাঁট-পাট দেয়, রান্নাবাড়া করে, শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীকে খাওয়ায় এবং সকলের শেষে স্বামীর পাতে স্বয়ং ভোজন করে। স্বামী-শ্বশুরের উপর রাজকন্যার একটা পরামর্শ ছিল এই, তাঁরা যেন কোন দিন খালি হাতে ঘরে না আসেন, নিদেন একটা কুটো হাতে নিয়েও যেন ঘরে ফিরেন। এক দিন ব্রাহ্মণ আর কিছু না পেয়ে একটা মরা কেউটে সাপ নিয়ে ঘরে আসেন। রাজকন্যা যত্ন ক'রে সেই মরা সাপটাই তুলে রেখে দেয়। রাজকন্যা হয়তো জানতো, জগতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুটিও কোন না কোন সময়ে মহৎ উপকারে আসে, তুচ্ছ ব'লেই কোন বস্তুর অপচয় করতে নেই। অপচয়ের মধ্য দিয়েই অনেক সংসার উচ্ছন্ন যায়, আর অপচয় রোধ করতে পারলে খুব টানাটানির সংসারেও প্রচুর সঞ্চয় হ'তে পারে। লক্ষ্মীর কৃপা লাভের অন্যতম উপায়—অপচয় রোধ এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুরও সদ্ব্যবহারের অভ্যাস। রাজকন্যার এ মহৎ গুণেই অবশেষে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ঘুচে যায়। কি ক'রে তাই বল্‌ছি।

মরা কেউটে সাপটা শুকিয়ে কাষ্ঠবৎ হয়ে আছে। এক দিন রাজকন্যা শুন্‌তে পায় রাজা রাজ্যে ঢোল-সহরাৎ করাচ্ছেন—তাঁর ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একটা কেউটে সাপের মাথা চাই, যে দিতে পারবে, তাকে তিনি প্রচুর ধন দান করবেন। রাজকন্যা শ্বশুরকে বলে—"ঢোল ধরুন, এই সাপটা নিয়ে যান, তবে রাজার কাছ থেকে কোনও ধন নেবেন না, শুধু চাইবেন কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে রাত্রে যেন রাজপুরী বা রাজ্যের কোথাও আলো না জ্বলে।" ব্রাহ্মণ তাই করেন। সাপের মাথা পেয়ে রাজার ব্যাধি সেরে যায় এবং ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত তিনি কার্ত্তিকী অমাবস্যা রজনীতে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রদীপ দান নিষিদ্ধ ক'রে দেন।

ক্রমে কার্ত্তিকী অমাবস্যা সমাগত। ঐ দিন লক্ষ্মীপূজা। দেবী রাজ্যের কোথাও আলো দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বনের ভিতরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে মিটি-মিটি প্রদীপ জ্বলছে দেখে তাঁর বাহন পেঁচা সেই ঘরেই দেবীকে নিয়ে যায়। দেবীকে দর্শন ক'রেই রাজকন্যা গলবস্ত্র হয়ে তাঁকে প্রণাম করে এবং ভক্তিভরে পূজো দেয় এবং বলে —"মা, আমরা বড় গরীব।" দেবী প্রসন্না হয়ে আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস দেন এবং ভক্তের প্রতি অহৈতুকী করুণায় সেই দরিদ্রের কুটীরে রেখে যান নিজের রাঙা পায়ের সোনার নূপুর দু'টি। উপদেশ দিয়ে যান—প্রতি কার্ত্তিকী অমাবস্যায় এমনি ভাবে তাঁর আরাধনার জন্য। দেবী অন্তর্হিতা। দেখতে

দেখতে পর্ণকুটীর বিশাল রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়। এ দিকে কিন্তু আর এক দৃশ্য—রাজার রাজলক্ষ্মী অস্তমিত। কারণ, রাজা দম্ভী, অহঙ্কারী, তিনি লক্ষ্মীর অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করেন না, তিনি নিজেই প্রজার ভাগ্যবিধাতা ব'লে নিজেকে প্রচার করেন। দম্ভ, অহঙ্কার ও নাস্তিক্য বুদ্ধির পরিণাম অধঃপতন। রাজা আজ পথের ভিক্ষুক।

পিতা ও পুত্রীর দীর্ঘ বিচ্ছেদ। অবশেষে একদা আসে পুনর্মিলনের শুভ অবসর। রাজকন্যা পিতার অনুসন্ধানের জন্যই যেন শ্বশুরকে এক পুকুর কেটে দেশসুদ্ধু লোককে নেমন্তন্ন ক'রে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাবার জন্য অনুরোধ করে। এমন লক্ষ্মী বউ, যার জন্য আজ ব্রাহ্মণের এত সুখ, এত সম্পৎ, তার ইচ্ছা কি অপূর্ণ রাখা সম্ভব? ব্রাহ্মণ পুকুর কেটে বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজের বার্ত্তা শুনে অন্যান্য সাধারণ লোকের সঙ্গে দরিদ্র রাজাও আসেন—তৃপ্তি সহকারে দু'টি খেতে পাবেন এই আশায়।

কন্যা চিনেছে পিতাকে। সে শ্বশুরকে দিয়ে ডাকিয়ে পিতাকে আনায় নিজ অন্তঃপুরে। পিতার পদধৌত ক'রে দিয়ে তাঁকে রূপোর পিঁড়িতে বসায়, সোনার থালতে অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়ে তাঁকে পরম সমাদরে ভোজন করাতে আরম্ভ করে। দরিদ্র রাজা তো অবাক্! তিনি কন্যাকে চিনতেই পারেন নি, তবু যেন চেনা চেনাই মনে হয়, নাড়ীসম্বন্ধের অজ্ঞাত টানেই যেন তিনি বার বার ক'রে তার দিকে তাকান, আর এক এক গ্রাস ভোজন করেন। অবশেষে তাঁর মুখে যেন আর একটি গ্রাসও উঠে না—দু'টি চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে আসে। কন্যারও অপলক দৃষ্টি পিতার প্রতি। দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদ এবং পিতার দীনদশা, দুই-ই তাকে অভিভূত করেছে। কন্যাও কাঁদে। এক অতি করুণ মুহূর্ত্ত। রাজা প্রশ্ন করেন—"মা, তুমি কাঁদছ কেন?" কন্যারও তো সেই প্রশ্ন। রাজাই বা কাঁদেন কেন? রাজা বলেন,—"তোমার মতই আমার এক কন্যা ছিল। আমি তাকে নিষ্ঠুরের মত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চির দিনের মত বিদায় দিয়েছি। জানিনে, সে আজো বেঁচে আছে কি না।" রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে আত্মপরিচয় দেয়। রাজা তাঁকে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। তিনি আজ নিজেই দেখুন—মা লক্ষ্মীই সকলের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী কি না। রাজার দর্প চূর্ণিত। তাঁর ভুল ভাঙ্গে। কন্যার উপদেশে লক্ষ্মীব্রত ক'রে তিনি আবার রাজ্য-সম্পৎ সব ফিরে পান।

লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কোথায়? উত্তর—ধান্যরূপা লক্ষ্মী ক্ষেত্রেই বসতি করেন। কৃষিই লক্ষ্মী। ভাল ক'রে কৃষি করলে জমিনেই সোনা ফলানো যায়, কোনো অভাব থাকে না, খাদ্যাভাব হয় না—এ তত্ত্বটিই ক্ষেত্রব্রতের উপাখ্যানে অভিব্যক্ত। এ তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ও আশ্রয়হীন জীবনের এক করুণ চিত্রও আমরা দেখতে পাই, এই ব্রতোপাখ্যানের ভিতর।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে বিষ্ণুপদ। শৈশবে পিতৃহারা। বিষ্ণুর মা নিরুপায় হয়ে শিশু পুত্রকে নিয়ে পিত্রালয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে আছে বিষ্ণুর মামা, আর মামী। বিষ্ণু আর বিষ্ণুর মা আসা মাত্রই সেই ঘরের গিন্নী দাসীকে এবং গরু চরাবার রাখালকে বিদায় দিয়ে দেয়। প্রথম দায়িত্ব গিয়ে পড়ে বিষ্ণুর মার উপর, দ্বিতীয় দায়িত্ব বিষ্ণুর নিজের উপর। এই অসহায় দু'টি প্রাণীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর তিরস্কার, দুর্ব্ব্যবহার লেগেই থাকে, ভাল খেতেও তাদের দেওয়া হয় না। কিন্তু, উপায় কি ? আর তো কোথাও আশ্রয় নেই!

বিষ্ণু এখন বড় হয়েছে। এক দিন মামা ডেকে বলে—"ওরে বিষ্টে, শুধু গরু চরালে কি আর পেট ভরে, কাল থেকে মাঠে চাষ করতে হবে, বুঝলি ?" বিষ্ণু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মামা তাকে লাঙ্গল, বলদ আদি কৃষির উপকরণ কিনে দেন। বিষ্ণু প্রতিদিন সকালে চাষে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে। মামীর ভয়ে দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে খেতেও পর্য্যন্ত আসে না। সন্ধ্যায় তার জন্য উচ্ছিষ্ট, বাসী, পরিত্যক্ত যা রাখা হয়, বিষ্ণু তা-ই খেয়ে কোন রকমে কষ্টের দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। অথচ, তারই অক্লান্ত শ্রমে অধুনা এ বাড়ীর অন্নসংস্থান হচ্ছে।

এক দিনের কথা। বড় হৃদয়বিদারক সেই কাহিনী। বিষ্ণুর মামী দু'মুঠো শুষ্ক অন্ন ছাড়া তার আহারের জন্য কিছুই আর রাখে নি। সারা দিন কর্ম্মক্লান্ত হয়ে বিষ্ণু ঘরে ফিরেছে। উপকরণের বালাই কিছুই নেই। কি দিয়ে সে খাবে ? দুধের কড়াতে একটা মস্ত সর পড়েছিল। বিষ্ণুর মা সেই সরটা তুলে ছেলের পাতে দেয়। এমনি সময়ে রুদ্রমূর্ত্তি গৃহিণীর আবির্ভাব। ননদকে তো যাচ্ছেতাই বলেই, পরে গৃহকর্ত্তার কাণেও মা-পোয়ের নামে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে উভয়কে বিদায় দেবার কু-পরামর্শ দেয়। ফল হয় এই, পর দিন বিষ্ণু ও বিষ্ণুর মায়ের সে বাড়ীতে আর স্থান হয় না। ওরা যথার্থতঃ আজ নিরাশ্রয়।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই ? প্রতিদিন কঠোর শ্রমে যে আপন শরীরের বিন্দু বিন্দু স্বেদ ভূমিতে মোক্ষণ করে, সে কি থাকবে নিরন্ন ? না, তা হ'তেই পারে না। তার জগতে আর কেউ না থাকুক, আছেন ক্ষেত্রলক্ষ্মী। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর মা সারা দিন খেতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যখন এক গাছের তলায় বসেছিল, তখন ক্ষেত্রলক্ষ্মী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে এসে তাদের সম্মুখে উপস্থিত। সে দিনটা ছিল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পক্ষের বৃহস্পতি বার। দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুর হস্তে কতকগুলি ধান্য অর্পণ করেন। দেবীর উপদেশ মত বিষ্ণু ঐ ধান্যের কতকাংশ মুদির দোকানে দিয়ে বিনিময়ে দই, মুড়ি, চিড়ে, গুড় কিনে মায়ে পোয়ে পেট ভ'রে খেয়ে একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে রাত্রে ঘুমিয়ে

থাকে, পরদিন ঘুম থেকে উঠে অবশিষ্ট ধান্য নিকটস্থ জলাজমিতে ছড়িয়ে দেয়। বিষ্ণু জানে কি ক'রে জমিতে সোনা ফলাতে হয়। মামার বাড়ী থেকে অন্ততঃ এ বিদ্যেটা শিখেছে। তদুপরি দেবীর অপার করুণা। সত্যই ঐ ধানে সোনা ফলে। ঐ দেশের জমিদার এ সংবাদ জেনে এবং প্রত্যক্ষ এ ঘটনা দেখে বিষ্ণুর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে ঐ সোনার ধানের ক্ষেত জামাইকে যৌতুক স্বরূপ দান করেন। বিষ্ণুর কুঁড়ে ঘরের স্থানে বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণের কাজ সুরু হয়ে যায়।

কৃষি যেমন লক্ষ্মী, কৃষকও তেমনি লক্ষ্মী। বিষ্ণুর মাতুল বিষ্ণুকে বিতাড়িত ক'রে বস্তুতঃ লক্ষ্মীকেই নির্ব্বাসন দিয়েছে। অসহায়া ভগিনী ও পিতৃহীন ভাগিনেয়ের উপর তার অনুষ্ঠিত দুর্ব্ব্যবহারগুলির ফলও তো অবশ্যই ফল্‌বে! কর্ম্মফল কে অতিক্রম করতে পারে? বিষ্ণুর মামা ও মামী উভয়েই আজ নিঃস্ব, নিরন্ন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উভয়েই শ্রমিকের কাজ নিয়ে এসেছে বিষ্ণুপুরের জমিদার বাড়ীর অট্টালিকা নির্ম্মাণের কার্য্যে। কিন্তু, সে জান্‌তো না যে, তার ভাগিনেয় বিষ্টের নামেই গড়ে উঠেছে নূতন বিষ্ণুপুর নগরী।

বিষ্ণু কিন্তু লক্ষ্য করে মামা ও মামীকে। হাজার হোক আপন জন তো। আর, এক দিন মামার অন্নও খেয়েছে। সুতরাং, মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিষ্ণু মামা ও মামীকে বাড়ীতে এনে খুব যত্ন ক'রে স্থান দেয়। তার পর প্রচুর ধন-সম্পৎ দিয়ে এবং অগ্রহায়ণে ক্ষেত্রব্রতের পরামর্শ দিয়ে নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। ক্ষেত্রব্রতের অনুষ্ঠানের ফলে বিষ্ণুর মামার ভাগ্য পুনঃ পরিবর্ত্তিত।

এবার মামার বাড়ী ভাগিনেয়ের সাদর নিমন্ত্রণ। বিষ্ণু তো আর সেই বিষ্টে নেই। সে আজ বিষ্ণুপুরের অধীশ্বর। অতীতে বহু দুর্ব্ব্যবহার পেলেও বিষ্ণু সে কথা আর স্মরণে রাখে নি। বিশেষতঃ সে জানতো, সকল অপ-নাট্যের গোড়া ছিল মামী, মামা নির্দ্দোষ। মামা বাড়ীর নিমন্ত্রণ সে বিনা আপত্তিতেই গ্রহণ করে।

মাতুলালয়ে বিষ্ণু। আজ তার কত আদর, কত আপ্যায়ন। মামার বাড়ীর সত্যিকারের আবদার আজই বোধ হয় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এ আবদার পূর্ব্বে সে কখনো পায় নি। মামীও আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ খাদ্যোপকরণের সঙ্গে এক বাটি ঘন দুগ্ধ বিষ্ণুর সম্মুখে তুলে ধ'রে মামী কেবলই উপরোধ করে ঐ দুধটুকু পান করার জন্য। দুধের উপরে পিচ্‌বোর্ডের মত মোটা একটা সর ভাস্‌ছে। ঐ দৃশ্য দেখে এবং মামীর পৌনঃপুনিক উপরোধ লক্ষ্য ক'রে বিষ্ণুর মনের অবচেতন স্তর থেকে সেই পুরাতন অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা যেন সহসা চেতনার উপর স্তরে

আপনাপনি ভেসে উঠে। মামার বাড়ীতে দুধের উপর সর কখনো সে চর্ম্মচক্ষে দেখে নি। এক দিন বিষ্ণুর মা গোপনে একটু সর তুলে তার পাতে দিয়েছিল, তার জন্য কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ডই না ঘটে গিয়েছিল! একি সেই মামা? সেই মামী? সেই মামার বাড়ী? যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মামার বাড়ীতে দুধে সর ভাসে, এ যেন আরো অবিশ্বাস্য ঘটনা। মামীর প্রতি বিস্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বিষ্ণুর প্রশ্ন—

সেই মামা সেই মামী সেই পুকুরপাড় ঘর।
আজ কেন গো দেখি মামী, দুধে পড়লো সর॥

মামী এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে? লজ্জায় অধোবদন। তবে বিষ্ণু অকৃতজ্ঞ নয়। স্বয়ং ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে সে উপকারী মাতুলকে ভুলে যায় নি। তাকেও সে বড় করেছে। আজীবন প্রতি বৎসরই বিষ্ণু মামাকে নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্রব্রত উদ্‌যাপন করে। তাদের দ্বারাই জগতে ক্ষেত্রব্রতের প্রচার হয়।

ভ্রাতৃজায়া কর্ত্তৃক বিধবা ননদিনীর অপমান, পরে লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্য্য লাভের দৃষ্টান্ত পৌষ মাসের ব্রতকথায়ও আমরা দেখি। ছ'টি নাবালক ছেলে আর একটি নাবালিকা মেয়ে নিয়ে কোনও ব্রাহ্মণী বিধবা হয়। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে আশ্রয় লয় ভাইয়ের বাড়ী। ভ্রাতৃবধূ বলে যে তাদের অবস্থাই খুব খারাপ, সাহায্য করবে কেমন ক'রে? তবে এইটুকু অনুকম্পা দেখায় যে, প্রতি দিন তাদের বাড়ীর চাল ঝেড়ে দিয়ে গেলে খুদগুলি ব্রাহ্মণী পাবে। নিরুপায় ব্রাহ্মণী তাতেই স্বীকৃতা। প্রতি দিন চাল ঝেড়ে দিয়ে যায়, আর খুদগুলি বাড়ী নিয়ে রান্না ক'রে কোন রকমে বাছাদের খাওয়ায়।

ভাইয়ের বাড়ীতে উঠুনে প্রকাণ্ড একটা লাউ গাছ। ব্রাহ্মণী ভ্রাতৃজায়ার কাছে দু'টো লাউয়ের ডগা ভিক্ষা চায়। ভ্রাতৃজায়া বলে—"ও ভাই, ওকথা মুখে এনো না। তোমার ভাই জান্‌তে পারলে রক্ষে রাখবে না।" তৃতীয় দিনে ভ্রাতৃজায়া নিজেই প্রস্তাব দেয় যে, তার মাথার উকুনগুলি বেছে দিয়ে গেলে সে গোপনে চারটি লাউপাতা ব্রাহ্মণীকে দিতে পারে। সে দিন ছিল বৃহস্পতি বার। উকুন বাছ্‌তে নেই। তা ছাড়া বেলাও বয়ে গেছে। বাচ্চাগুলি ঘরে অনাহারে পড়ে ধুঁকছে। খুঁদ রান্না হবে, তবে আধপেটা খেতে পাবে। ব্রাহ্মণী এ সকল কারণ দর্শিয়ে বলে—"কাল বেছে দেব।" ভ্রাতৃজায়ার তো ভীষণ রাগ। ব্রাহ্মণীর আঁচল থেকে খুঁদগুলি কেড়ে নিয়ে বলে—"তুমি নিজের মঙ্গলটাই বোঝ, ভাইয়ের মঙ্গল বোঝ না? বৃহস্পতি বার খুদ নিয়ে যাচ্ছ কি ক'রে?" ব্রাহ্মণী অপ্রতিভ। রিক্ত হস্তে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর দিকে যাত্রা করে।

পথে একটা মরা গোখ্‌রো সাপ। ভাবে—এ মরা সাপটা রেঁধে খেয়ে সবাই মরবো, এত দুঃখ আর সহ্য হয় না। যেই কথা, সেই কাজ। ব্রাহ্মণী সাপটা এনে সকলের অগোচরে সেটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটে এবং হাঁড়িতে সিদ্ধ চাপায়। কিন্তু, দেবী লক্ষ্মীর কি অহৈতুকী করুণা! তাঁর ইচ্ছায় ভিক্ষুক রাজায় পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রেও হয় তা-ই। সাপ সিদ্ধ হ'তে গিয়ে এত সোনার ফেন উপ্‌চিয়ে পড়তে থাকে যে, তাতে ঘরের মেঝে ভেসে যায়। এ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে ব্রাহ্মণীর আনন্দ আর ধরে না। একটা সরা ক'রে খানিকটা সোনার ফেন ছেলের হাতে দিয়ে সেক্‌রার দোকানে পাঠিয়ে দেয়। ছেলে সেই সোনা বিক্রয় ক'রে তা দিয়ে খাদ্য ও পরিধেয় কিনে নিয়ে আসে। সে দিন ছিল লক্ষ্মীবার। ব্রাহ্মণী দেবীর পূজা ক'রে পিঠে পায়েস ভোগ দেয়। বারোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, পাড়া-পড়শিদের ঘরে ঘরে প্রসাদ বিলি ক'রে দিয়ে আসে, ছেলেমেয়েদের পেট ভরে খাওয়ায়, শেষে নিজে খায়। ঐ সাপ থেকে এত সোনা উঠে যে, ব্রাহ্মণীর দুঃখ আর থাকে না। ছ'মাসের মধ্যে রাজবাড়ীর মত মস্ত বাড়ী, হাতীঘোড়া, লোকজন, সৈন্যসামন্ত সব হয়। মেয়েটির বিয়ে হয় সে দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে। ছেলেদেরও বিয়ে হয় সব বড় বড় ঘরে। সুখ-ঐশ্বর্য্য যেন উথ্‌লে পড়ে।

"এ সব কথা কি সত্য? কি শুনছি এ সব? ননদিনী এত বড়লোক হয়েছে?"—ভ্রাতৃজায়ার মনে কৌতূহল ও সন্দেহ। ব্যাপারটা সঠিক উপলব্ধির জন্য সে একদা ননদিনীকে সপরিবারে স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানায়। ব্রাহ্মণী ছেলে মেয়ে ও বউদের হীরেমুক্তোর অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদিতে সজ্জিত ক'রে পাল্কী চড়ে ভাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত। দেখেই তো ভ্রাতৃজায়ার চক্ষুঃ স্থির। তাদের বসবার জন্য ভাল ভাল আসন দেয় এবং আহার্য্যের ব্যবস্থাও হয় প্রচুর। ব্রাহ্মণীর পুত্রবধূরা সব ঘটনা শুনেছিল, কন্যা তো সব জানতোই। ওরা হীরেমুক্তোর অলঙ্কারগুলি খুলে ঐ আসনে রেখে আপনা আপনি বলে—

"সোনাদানা হীরেমুক্তো ধন্য মান্য গণ্য।
যাদের কল্যাণে আজ মোদের নেমন্তন্ন॥"

"ওরা এ সব কি বলছে, ঠাকুর ঝি?"—ভ্রাতৃজায়া প্রশ্ন করে ব্রাহ্মণীকে। ব্রাহ্মণী কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেয়। এ সংসারে অসময়ের বান্ধব খুব অল্পই আছে, কিন্তু, সুসময়ে অনেক বান্ধবেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্যের সমাদরই অধিক, দারিদ্র্যের সহানুভূতি কম। যখন ব্রাহ্মণী অসহায়া ছিল, তখন ভ্রাতৃবধূ প্রাণ খুলে একটা লাউ-এর ডগা দিয়ে সাহায্য করতে পর্য্যন্ত রাজী হয় নি, তারই পারিশ্রমিক স্বরূপ লব্ধ খুদ্-কুঁড়া পর্য্যন্ত আঁচল থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু, আজ তার ঐশ্বর্য্য হয়েছে, তাই তার সমাদরও

বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক'রে অবশেষে ব্রাহ্মণী বলে—"ভাই, বুঝতে পারছো না, ওরা বল্‌ছে, নেমন্তন্ন তো আর আমাদেরকে কর নি, করেছ আমাদের হীরেমুক্তো, সোনাদানাকে। তাই ওরা তোমার দেওয়া আসনে নিজেরা না বসে ওদের অলঙ্কারগুলিকে বসিয়েছে।"

ভ্রাতৃজায়া লজ্জায় যেন মরমে মরে যায়। সে তার পূর্ণ দুর্ব্ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব পেয়েছে। সে ননদিনীর হাত ধ'রে কেঁদে ফেলে। সে ক্ষমা-প্রার্থিণী। ব্রাহ্মণী নীরবে সকলকে নিয়ে বাড়ী চলে আসে। ভ্রাতৃজায়ার যদি যথার্থ অনুতাপ এসে থাকে, তবে তাতেই ব্রাহ্মণী সুখী। অনুতাপই ওর জীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। ব্রাহ্মণীর আর কি বলার আছে ?

চৈত্রমাসের ব্রতকথা। চৈত্র মাস—মধুমাস। বসন্তের সুখস্পর্শ পেয়ে ধরণী নূতন সাজে সজ্জিতা হয়। মাঠে মাঠে সর্ষপ ও তিলফুল ফুটে। সহস্র সহস্র ভ্রমর সেই ফুলের মধু পান ক'রে গুঞ্জরণ করে। এমনি দিনে মা লক্ষ্মী রবিশস্যের বিরাট সম্ভার নিয়ে ভূলোকে অবতীর্ণা হন। মর্ত্ত্যবাসী ভক্তগণ নূতন উপচারে দেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়।

এমনি এক বসন্তের দিনে নারায়ণের ইচ্ছা হয় তিনি মর্ত্ত্যলোকে যাবেন মর্ত্ত্যবাসীরা কেমন সুখে আছে পরিদর্শনের জন্য। নারায়ণ পুষ্পক রথে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় লক্ষ্মী ছুটে এসে তাঁর হাত ধ'রে অনুনয় করেন তাঁকেও নিয়ে যাবার জন্য। নারায়ণ প্রথমে রাজী হন না, পরে এক শর্ত্তে রাজী হন—লক্ষ্মী রথ থেকে নাম্‌তে, আর উত্তর দিকে যেতে পারবেন না। লক্ষ্মী তাতেই স্বীকৃতা। কিন্তু, উত্তর দিকের তিল ফুলের আকর্ষণ তাঁকে ব্যাকুল করে। তিনি নারায়ণের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে রথ থেকে নেমে তিল ফুলের ক্ষেতে প্রবেশ ক'রে প্রচুর ফুল তুলে প্রকাণ্ড মালা গেঁথে স্বয়ং গলায় পরেন এবং কিছু ফুল আঁচলে বেঁধে নিয়ে রথে এসে বসেন। এমন সময় নারায়ণ উপস্থিত। বলেন—"একি করলে লক্ষ্মি, আমার নিষেধ শুন্‌লে না! না ব'লে অন্যের ক্ষেতে তিল ফুল তুল্‌তে গেলে! যাও, এবার তিল-সন খাট্‌তে হবে, বার বৎসর আমাকে ছেড়ে খাটগে।" আঁচলের তিল ফুল-গুলি নারায়ণের চরণে অঞ্জলি দিয়ে দেবী রোদন করতে থাকেন। নারায়ণ বলেন—"তোমাকে তিল-সন খাট্‌তেই হবে, তবে চল আমি তোমাকে ক্ষেতের মালিকের ঘরে রেখে আসি।" লক্ষ্মী ও নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে উপস্থিত। নারায়ণ লক্ষ্মীকে সে-ঘরে দিয়ে গৃহকর্ত্তাকে বলেন—"এ বৃদ্ধা তোমার ক্ষেত থেকে তিল ফুল তুলেছিল, তাই তিল-সন খাটতে এসেছে। একে রাখ, তবে কখনো একে এঁটো খেতে দিও না, ঘর ঝাড় দিতে দিও না, বাসি কাপড়-চোপড় কাচিয়ো না, এ ছাড়া সব করবে।" ব'লেই নারায়ণ চলে যান।

ভক্তের কারণেই ভগবানের লীলা। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃপা করবেন ব'লেই তো দেবী তাঁর গৃহে সমাগতা। দেবীর আগমনের পর আশ্চর্য্য ভাবেই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচন হয়। তাঁর অভাব-অনটন কোথায় চলে যায়। ব্রাহ্মণ এবং তাঁর গৃহের অন্যান্য সকলেই উপলব্ধি করে—ইনি ছদ্মবেশিনী কোনও দেবতা হবেন। সকলেই তাকে সম্মান করে। কিন্তু, ব্রাহ্মণের মেজো পুত্রবধূর বড় ঈর্ষ্যা। খাট্‌তে এসে এঁটো খাবে না, ঝাড়ু দেবে না, কাপড় কাচবে না—এত গোমর কেন? লক্ষ্মী ওর মন বুঝেন। ঐ বউটা খেতে দিলে তিনি খান না। অভক্তের দেওয়া দ্রব্য তো তিনি গ্রহণ করেন না। ঐ সব খাবার তিনি বাড়ীর পাশে একটা বেলতলায় পুঁতে রাখেন।

বার বৎসর উত্তীর্ণপ্রায়। বাড়ীর সকলে এক মস্ত যোগ উপলক্ষ্যে গঙ্গায় স্নান করতে গেছে। বৃদ্ধারূপিণী লক্ষ্মী যান নি। তিনি ওদের সঙ্গে পাঁচ কড়া কড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর নাম ক'রে গঙ্গায় সমর্পণ করতে। গঙ্গার ঘাটে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। সেই কড়িগুলি গঙ্গায় দিতেই স্বয়ং গঙ্গাদেবী মকর বাহনে এসে নিজের আঁচল পেতে সেগুলি নিয়ে পুনশ্চ অন্তর্হিতা। এ ঘটনায় ব্রাহ্মণের আর কোনও সন্দেহ রইলো না যে, তাঁর ঘরে যে বৃদ্ধা তিল-সন খাট্‌তে এসেছেন তিনি নিশ্চয়ই কোনও দেবী হবেন। গঙ্গাস্নান সেরে সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে। বাড়ীতে এসেও দেখেন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। গোলোক থেকে পুষ্পক রথ এসেছে। বৃদ্ধা এক পা মাটিতে এবং এক পা রথের উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর যাবার সময় হয়েছে। ব্রাহ্মণী ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বৃদ্ধার পা দু'টি জড়িয়ে ধরেন—"মা, অপরাধ নিও না, আমরা তোমাকে এত দিন চিন্‌তে পারি নি, তুমি দয়া ক'রে থাক মা, আমাদের অনাথ ক'রে যেও না।" কিন্তু, দেবীর তো আর থাকার উপায় নেই। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে স্বধামে যাত্রা করেন। যাবার সময় ব'লে যান, বেলতলার কথা। সেখানে যা পোঁতা আছে, তা তুলে নিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের আর কোন কষ্ট থাকবে না। নিয়মিত লক্ষ্মীপূজার উপদেশও দিয়ে যান।

বাড়ীর মেজো বউ যেমন ক্ষুদ্রমনা ও ঈর্ষ্যাপরায়ণা, তেমনি লোভিনী। মা লক্ষ্মীকে তো কোন দিন যত্ন করে নি, আজ ধন পাবার লোভে সকলের আগে সে বেলতলা খুঁড়তে গেল। দেবীর উপরে যার বিশ্বাস নাই, সে তো আশীর্ব্বাদ পায় না, তার জীবনে আসে মৃত্যুময় অভিসম্পাত। মেজো বউ বেলতলা খুঁড়তেই বেরুয় এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ। এক ছোবল দিতেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। পরিবারের অন্যান্য লোকেরা খুঁড়তেই প্রচুর ধন-রত্ন উঠে। লক্ষ্মীর দানে তাঁদের ঘর ভ'রে যায়। বছরে চার বার তারা ভক্তি সহকারে লক্ষ্মীপূজা করে। সংসারের কোন কষ্টই তাদের আর থাকে না।

গুপ্তধন পেয়ে দীনতম অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যেও এ-রূপ ঘটনা কোন কোন সময় আমরা দেখি। হঠাৎ পাওয়া ধন, গুপ্তধন—এ পথেও মা লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্যময় কৃপা বিশেষ বিশেষ আধারে বর্ষিত হতে পারে, হয়ও।

সূর্য্যপর্ব্ব

কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মাঘ মণ্ডলের ব্রত মূলতঃ সূর্য্যের উপাসনা, তা আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমাদের ঘরের সধবা মহিলারা যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন, তার মধ্যেও এমন অনেক গুলি আছে যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপাস্য হচ্ছেন সূর্য্য। রালদুর্গার ব্রত, মৌনী অমাবস্যা ব্রত, বারোমেসে অমাবস্যা ব্রত প্রভৃতি এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে। পণ্ডিতেরা বলেন—ইতুর ব্রতও মূলতঃ মিত্র বা সূর্য্যের উপাসনা। রোগ-নিরাময়, ঐশ্বর্য্য লাভ প্রভৃতির সঙ্কল্পে সূর্য্য বিষয়ক প্রাগুক্ত নানা ব্রত সম্পাদিত হয়ে আস্‌ছে। ব্রতকথার ভিতর দিয়ে আমরা তা দেখতে পাব।

রালদুর্গার ব্রত ক'রে রাজকন্যা ইচ্ছামতী তার কুষ্ঠগ্রস্ত বৃদ্ধ স্বামীকে ভাল করেছিল এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও সুসন্তান লাভ করেছিল। ইচ্ছামতী ছিল সূর্য্যের ব্রতদাসী। বৃদ্ধ কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েই স্বয়ংবর সভায় রাজকন্যা তাকে পতিত্বে বরণ করে। বিবাহের পর সে হয় স্বামীসহ বনবাসী। বারটি বৎসর সে ঐকান্তিকী সেবা ও নিষ্ঠায় কুষ্ঠী স্বামীর সেবা করে। কিন্তু, তাকে ভাল করতে পারে নি। ঈশ্বরের কি বিচার নেই? এই প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া মাত্রই এক অভাবনীয় উপায়ে তার কাছে রালদুর্গার ব্রতমাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। ইচ্ছামতী যথাকালে এবং যথানিয়মে সে ব্রতের আচরণ করতেই স্বয়ং সূর্য্যদেব তার সম্মুখে ভাস্বর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং ব্রতিনীকে বর চেয়ে নিতে বলেন। সূর্য্যের বরে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের কন্দর্পের মত চেহারা হয়, তার পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হয় এবং ইচ্ছামতীর একটি অতি সুন্দর পুত্র লাভ হয়। কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে বরণ করায় রাজা ইচ্ছামতীকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন। সূর্য্যের প্রসাদ প্রাপ্তির পর একদা এক বিশেষ মুহূর্ত্তে পিতা-পুত্রীরও পুনর্মিলন হয়। রালদুর্গার ব্রতানুষ্ঠানে রাণীও এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল পৃথিবীর সুখ-ভোগের পর তাঁদের সকলেরই অক্ষয় স্বর্গলাভ।

সূর্য্য এবং বিষ্ণু মূলতঃ একই। মৌনী আমাবস্যা ব্রতে দেখি, তিনি কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ ক'রে ভক্তকে পরীক্ষা করেছিলেন। কোনও এক ব্রাহ্মণকুমারী বিবাহবাসরেই বিধবা হয়। প্রতিবেশিনী এক গয়লানী তার সাতটি মৌনী অমাবস্যার পুণ্য ফল দিলে মৃত বর বেঁচে উঠে। কিন্ত, ব্রতফল দান করায় গয়লানীর হয় সর্ব্বনাশ। তার স্বামী-পুত্র মরে যায়। সর্ব্বনাশ

হবে জেনেও গয়লানী কেবল পরোপকারার্থেই নিজ ব্রতফল দান করেছিল। পরের উপকারের জন্য নিজ সর্ব্বনাশকেও যে স্বেচ্ছায় বরণ করতে পারে, সে-ই তো আসল দেবভক্ত। তার জীবনব্রত সার্থক হয়েছে, বুঝতে হবে। এমন নিঃস্বার্থ সেবাব্রতীর কখনো অশুভ হতে পারে কি ?

পূর্ব্বে কোন অতিথির মুখে জানা গিয়েছিল যে, বিবাহবাসরে উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যার মৃত স্বামীকে ব্রতফল দিয়ে যে পুনর্জীবিত করবে, প্রথমটায় তার নিজের মারাত্মক ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতিরও প্রতিকার আছে। বনের ভিতরে যে কুষ্ঠ রোগী আছে, তার মাথায় এক ভাঁড় দই ঢেলে দিয়ে জিভ্ দিয়ে তা তুল্‌তে হবে। গয়লানী একথা শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় ঐ রোগীর মাথায় ঢেলে দেওয়া দই জিভ্ দিয়ে অনায়াসে তুলে নেয়। ঐ কুষ্ঠ রোগী আর কেউ নন। তিনি স্বয়ং নারায়ণ। ভগবান্ আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন—"তোমাদের বার-ব্রতে বিশ্বাস আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্যই তোমাদিগকে আমি ছলনা করেছি।" নারায়ণের উপদেশ—"ধর্ম্মে মতি রেখো, ভক্তি ভরে বার-ব্রত কোরো, তা হলে কখনো কোন কষ্ট হবে না।" ব'লেই তিনি অন্তর্ধান করেন। গয়লানীর স্বামী-পুত্র আবার হাসিমুখে বেঁচে উঠে।

বারমেসে অমাবস্যার ব্রতকথায় জানা যায়, স্বয়ং সূর্য্যদেব শাপভ্রষ্ট হয়ে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণী জান্‌তো না ছেলের প্রকৃত পরিচয়। ব্রাহ্মণী ছেলের বিবাহও দিয়েছিল। কিন্তু, সে আর ঘরে থাকার ছেলে নয়। তাই বিবাহের পর ছেলে হয় গৃহত্যাগী। অবশ্য বহু কাল পর ছেলে গৃহে ফিরে আসে, কিন্তু তার মা বা স্ত্রী কেউ তাকে চিন্‌তে পারে না। সূর্য্যদেব প্রথমটা নানা ছলনা ক'রে পরে নিজ পরিচয় দেন। মা ও স্ত্রীর জন্য কিছু সম্পদের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তিনি আবার চলে যান। তার পর থেকে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, কিন্তু থাকতেন না। একদা ব্রাহ্মণী স্থির করে—এবার ছেলে এলে আর যেতে দেওয়া হবে না। মনে যা ভেবেছিল, কাজেও করে তা-ই। পুত্ররূপী সূর্য্যদেব আস্‌তেই ঘরে তালা বন্ধ ক'রে দেয়। ক'দিন আকাশে আর সূর্য্য উঠে না। বিশ্ববাসী স্তম্ভিত, দেবতারা উদ্বিগ্ন। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নেমে আসেন ব্রাহ্মণীর পর্ণকুটীরে। এত দিনে ছেলের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে ব্রাহ্মণী বলে—"সূর্য্যকে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমরা যাব কোথা ?" সূর্য্য মা ও স্ত্রীকে অমাবস্যা তিথিতে সপ্তাশ্বযোজিত জ্যোতির্ম্ময় রথে চড়িয়ে স্বর্গে নিয়ে যান। ঐশ্বর্য্যের চেয়ে এ ব্রতে মুক্তির প্রয়োজনই যেন বড় হয়ে উঠেছে।

সূর্য্যপর্ব্বে ইতুর ব্রতকথা বেশ শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী। ত্যাগ ও ভোগ, আস্তিক্যবুদ্ধি ও নাস্তিক্যবুদ্ধি এতদুভয়ের শুভ ও অশুভ পরিণামের চিত্রটি এ ব্রতোপাখ্যানে পরিষ্কার হয়েফুটে উঠেছে।

এক আত্মভোগসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ। তার দু'টি কন্যা। বড়টির নাম উম্‌নো, আর ছোটটির নাম ঝুম্‌নো। ব্রাহ্মণ দু'টি কন্যাকে বনবাসে দেয়। অপরাধ—কন্যাদ্বয় ব্রাহ্মণের জন্য তৈরী গুন্‌তি করা অনেকগুলি পিঠের মাত্র দু'টি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে খেয়েছিল। পিতা কন্যাদ্বয়ের উপর অতি নিষ্ঠুরের মত আচরণ করলেও উভয়ের বনবাসের ফল শেষ পর্য্যন্ত পরম শুভই হয়। উম্‌নো-ঝুম্‌নো বনের ভিতর দেবকন্যাগণের অনুসরণে ইতুর ব্রত ক'রে বর চেয়ে নেয়—"আমাদের পিতার দুঃখ দূর হোক, ঘরবাড়ী হোক, হাতী-ঘোড়া হোক, ধন-দৌলত হোক, রাজার মত বর হোক।" ব্রতের পর দু'বোনে ইতুর ঘট নিয়ে পিত্রালয়ে এসে দেখে সেখানকার চেহারা সম্পূর্ণ নূতন। মেয়ে দু'টোকে দেখে ব্রাহ্মণ বলে—"তোরা আবার এসেছিস্, ছিলি না, আমাদের দিন ফিরেছিল। দ্যাখ না, আমাদের কত ঐশ্বর্য্য!" উম্‌নো-ঝুম্‌নো বলে—"অত অহঙ্কার কোরো না বাবা, বনে আমরা ইতুর ব্রত করেছিলুম, তাই তুমি এত পেয়েছ।"

বেশ কিছু দিন কেটে যায়। একদা সে দেশের রাজা তাঁর পাত্রকে নিয়ে সদলবলে মৃগয়ায় বহির্গত। পথে বড় তৃষ্ণা। কোথায় জল? নিকটে অন্য কোনও আশ্রয় না পেয়ে রাজা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উঠেই পিপাসার জল চান। উম্‌নো-ঝুম্‌নো ছোট্ট ইতুর ঘটে ক'রে জল নিয়ে আসে। "এ কি পরিহাস? এতটুকু জলে কা'র তৃষ্ণা নিবারণ হবে?"—রাজা বিরক্ত। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত যা ঘটে তা প্রত্যক্ষ ক'রে রাজা অতিমাত্র বিস্মিত। ঐ ঘটের অফুরন্ত জলে রাজার বিরাট বাহিনীর জলতৃষ্ণা অক্লেশে নিবারিত হয়। কন্যাদ্বয়ের আশ্চর্য্য গুণ দেখে রাজা ও তাঁর পাত্র তাদিগকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজার সঙ্গে বিয়ে হয় উম্‌নোর, আর পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয় ঝুম্‌নোর।

"হ্যাঁ, মা, তোদের কার কি চাই বল।" পতিগৃহে যাবার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যাদ্বয়কে প্রশ্ন করেন। ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য লাভ ক'রে উম্‌নোর মাথা যায় বিগড়ে, সে বলে—"আমার জন্য মাগুর মাছ আর ছাঁচি-পান আনাও। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে হাতীতে চড়ে যাব।" ঝুম্‌নো আত্মবিস্মৃত হয় নি। সে জানে, সে দিনটা অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার। সে বলে—"কলা, পাটালি, ফলমূল নিয়ে এসো, ইতুপূজা ক'রে নিরামিষ খেয়ে ঘট নিয়ে হাতীতে চড়ে যাব।" পিতা দুই কন্যাকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী একজনকে ভোগোপকরণ এবং অন্যকে পূজোপকরণ আনিয়ে দেন। দু'কন্যা দুই মনোভাব নিয়ে দুই পথে পতিগৃহে যাত্রা করে। ফলও হয় দু'প্রকার। উম্‌নো যে পথে যায় সে পথে শুধু গৃহদাহ, মড়ক, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি। ঝুম্‌নো যে পথে যায় সে পথে শুধু বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশনাদি উৎসব। উম্‌নোর স্পর্শে স্বর্ণ লৌহে পরিণত হয়, ঝুম্‌নোর

স্পর্শে লৌহ স্বর্ণময় হয়। উম্‌নোর সর্ব্বত্র অনাদর, ঝুম্‌নোর রাজকীয় সমাদর। সংসারজীবনেও দেখা যায় উম্‌নোর জন্য রাজা দিন দিন হতশ্রী, আর ঝুম্‌নোর পুণ্যবলে পাত্র দিন দিন শ্রীমান্। রাজা স্থির করেন—এ অলক্ষ্মীটাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই সমীচীন। পাত্রের উপর আদেশ হয়—উম্‌নোর শিরশ্ছেদনের।

ঝুম্‌নো সকল ঘটনাই শুনে। সে কৌশলে সকলের অজ্ঞাতসারে অগ্রজা ভগিনীকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে দেয়। কোটাল একটা কুকুর কেটে রাজাকে রক্ত দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেয় রাণীর প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়েছে। ঝুম্‌নোর কৌশলে উম্‌নো এ যাত্রা প্রাণে বাঁচে বটে, কিন্তু একটা আত্মজিজ্ঞাসা,—তার আজ এ শোচনীয় দুর্দ্দশা কেন? ইতুর পূজো সে ভুলেছে, ভোগবাদে সে প্রমত্ত হয়েছে, তাই তার জীবনের সকল দিকেই আজ অন্ধকার। ওদের পিতৃগৃহেও আজ ইতুর সমাদর নেই, সেখানেও তাই নানা অনিষ্টোৎপত্তি। ঝুম্‌নো মা ও ভগিনীকে দিয়ে যথাকালে পুনরায় ইতুর ব্রত করাতেই সকল দুর্দ্দৈব কেটে যায়। রাজার রাজ-বৈভব পুনরায় ফিরে আসে, 'অস্মরণ' রাজার আবার উম্‌নোর কথা স্মরণ হয়। উম্‌নো-ঝুম্‌নোর পিতৃগৃহের দুর্ভাগ্যও কেটে যায়। রাজরোষে চক্ষুঃহারা ও পুত্রহারা এক হাড়িনীও তার আঠারোটি মৃত পুত্রসহ নষ্ট চক্ষুর্দ্বয় ফিরে পায়। ইতুর মহিমা জগতে প্রচারিত হয়।

সধবাব্রতের অবদান

সধবা-ব্রতকথার ঝুলি ফুরিয়ে এলো। একটা বিষয় যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখি যে, ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে শুধু কথার মধ্যেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে নি, এদেশে কথাও হয়েছে প্রচুর, কাজও হয়েছে অফুরন্ত। উম্‌নো-ঝুম্‌নো, আকুলী-সুকুলী, সুমঙ্গল-শঙ্খপতি, জয়দেব-জয়াবতী, বিষ্ণু, শ্রীমন্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি এদেশে কেবল ব্রতোপাখ্যানের বিষয়-বস্তু হয়ে থাকে নি। ব্রতাচরণের সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের গৃহ-সংসারে এরূপ কত শত উন্নত চরিত্রের নরনারী যে জন্মলাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এটিই হ'লো সধবাব্রতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃপুরুষেরা মানুষ গড়ার কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একথা গর্ব্ব সহকারে ঘোষণা করতে আমাদের কখনো যেন কোনও কুণ্ঠাবোধ না হয়। তাঁদের ব্রত ও তপস্যার পুণ্যবলেই আজো আমরা স্বকীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুরুষপরম্পরাগত ধারা নিয়ে বেঁচে আছি, একথা দিবালোকের ন্যায়ই সত্য। আরো আমাদের জানা উচিত—শুধু ব্যক্তির গঠন নয়, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র গঠনের শাশ্বত উপাদানও তাঁরা আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দিয়ে গেছেন এবং তা দিয়েছেন জাগ্রৎ ধর্ম্মীয় অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়েই। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে ক্রমে ক্রমে তা দেখতে পাব।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রতোৎসব ও আদর্শ পারিবারিক জীবন

কতকগুলি প্রস্ফুটিত কুসুমকে এক সূত্রে গেঁথে নিয়ে যেমন একটি মাল্য রচিত হয়, তেমনি কতকগুলি ব্যক্তির একককে প্রেম ও ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত ক'রে হয় একটি সংহতিবদ্ধ পরিবারের সৃষ্টি। একটি মাল্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশের স্বার্থে যেমন বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন জাতের ফুলই থাক্‌তে পারে, তেমনি একটি পরিবারের মধ্যেও মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী, বধূ, জামাতা, কাকা, কাকী, জেঠা, জেঠী, নাতি-নাতনী প্রভৃতি নানা সম্পর্কের, নানা বয়সের ও নানা রুচি ও সংস্কারসম্পন্ন মানুষ থাকে। ব্যক্তির জীবনটিকে স্তরে স্তরে বিকশিত ক'রে তুল্‌তে হিন্দুর ঘরের ব্রত-পার্ব্বণ সমুদয় কি মহতী ভূমিকা নিয়ে কাজ করেছে, তা কুমারীব্রত ও সধবাব্রতের আলোচনায় নিশ্চয়ই আমরা লক্ষ্য করেছি। এক্ষণে পারিবারিক জীবনের উপরোক্ত সম্পর্কগুলিকে সুন্দর ও সুপরিস্ফুট ক'রে একের সঙ্গে অন্যের প্রাণের বন্ধনকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করতে নানা শ্রেণীর ব্রত-পার্ব্বণ কি ভাবে সাহায্য করেছে, সেই তত্ত্বটিই আলোচিত হবে। অর্থাৎ, এতক্ষণ আমরা মানবিকতার বিশাল বাগিচায় কেবল ফুল ফুটানোর কাজ করেছি, সরোবরের জলে কেমন ক'রে কমলকলিটি ক্রমে ক্রমে শতদল বিস্তার পূর্ব্বক আপন সৌন্দর্য্য ও সুরভি বিকিরণ করে, তা গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এবার আমরা মাল্য রচনায় মনোনিবেশ করবো। ফুল তো শুধু বাগিচার প্রদর্শনীর বস্তু নয়, কিম্বা কেবল সরোবরের শোভাবৃদ্ধির জন্যও নয়, তাকে কল্যাণকর বা আনন্দজনক উৎসবের কাজে লাগাতে হয়, দেবতার চরণে অঞ্জলিভরে গুচ্ছবদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়, বিরলে বসে গাঁথা হারখানি প্রেমের পরা কাষ্ঠারূপে ইষ্টের শ্রীকণ্ঠে অনুরাগের সঙ্গে পরিয়ে দিতে হয়, তবেই তো কুসুমের জন্ম সফল। নতুবা বিনা প্রয়োজনে সে ফুট্‌লো, আবার বিনা প্রয়োজনেই আপনি ঝ'রে পড়ে শুকিয়ে গেল, তবে আর তার এত সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিকাশের সার্থকতা কি?

কুমারীব্রতকল্প ও সধবাব্রতকল্পের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তির আত্মবিকাশের যে বিশিষ্ট গতিপ্রবাহ আমরা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমরা দেখেছি, সে গতিপ্রবাহটি শুধু নিজেকে ঘিরেই আবর্ত্তিত নয়—পূতিগন্ধময় ব্যষ্টিস্বার্থকে কেন্দ্র ক'রেই সে আপন যাত্রা আরম্ভ করে নি, একটি উচ্চতর ও মহত্তর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে প্রবল জোয়ারের টানে ব্যাকুল আবেগে সে আগের দিকেই শুধু বেগে ছুটে যেতে চেয়েছে। সে গতিপ্রবাহটি সমষ্টিমুখী—পরিবারের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, জাতির স্বার্থকে পরিপূর্ণতা দান ক'রে অবশেষে

নিজেকে ভূমার চৈতন্যে মিলিয়ে দিতে সে কতই না উদ্‌গ্রীব। ব্রতের উদ্‌যাপনার ভিতর দিয়ে উপাস্যের সান্নিধ্যে ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সে চেয়েছে সত্য, কিন্তু তা কেবল আত্মসুখের জন্য নয়, পরন্তু বহুর সেবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই। ফুলটি নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'লে তবে তো সে অন্যকে গন্ধ ও আনন্দ বিতরণ করবে। সে যদি নিজেই পূর্ণতা অর্জ্জন করতে না পারে তবে সে অন্যের সেবা কেমন ক'রে করতে পারে? কুমারীব্রতে কুমারীরা চেয়েছে আত্মবিকাশ, সধবাব্রতের ব্রতিনীদের মধ্যে সেই আত্মবিকাশের পিপাসা অধিকতর উদগ্র, কিন্তু তা পারিবারিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণচিন্তাগুলিকে বুকে ক'রে নিয়েই। তাদের ভাবনা শুধু তাদের একার জন্য নয়—সকলের জন্য। পিতামাতার কল্যাণ, ভ্রাতার কল্যাণ, স্বামীর কল্যাণ, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ, আত্মীয়-পরিজনের কল্যাণ, কন্যা ও বধূর কল্যাণ, গো-মহিষাদি গৃহ-পালিত পশুবর্গের কল্যাণ, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধন-সম্পত্তির কল্যাণময় বৃদ্ধি—এ সবের জন্যই তো তাদের ব্রতের পর ব্রতের আচরণ—তাদের নিরবচ্ছিন্ন তপস্যা। এ তপস্যার ভিতর দিয়েই তো জন্ম লাভ করেছে ভারতের হিন্দুর আদর্শ পরিবার। সেখানে স্বার্থ নয়, আত্মত্যাগ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সহযোগিতা; ভোগ নয়, সংযম; দ্বন্দ্ব নয়, প্রেম ও ভালবাসাই বড় কথা। এ শিক্ষা ধর্ম্মই দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় ভারতের পারিবারিক জীবনও ধর্ম্মীয় আদর্শের উপরই বিধৃত। তাই ভারতের পারিবারিক জীবন এত সুন্দর, এত সুশৃঙ্খল, এত মাধুর্য্যমণ্ডিত। নানাবিধ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান পারিবারিক জীবনের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে অধিকতর সুস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে—একের সঙ্গে অন্যকে আত্মিক বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। সত্য সত্যই হিন্দুর পরিবার যেন কতকগুলি সমপ্রাণ মানুষের দ্বারা সুগ্রথিত এক অনুপম কুসুমহার। পৃথিবীতে এ অতুলনীয়। পাশ্চাত্য ভোগবাদ ও নিরীশ্বর বাদের প্রবল সঙ্ঘাতেও আজো তা ভেঙ্গে পড়ে নি। হিন্দুর সংসারে স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভগিনীতে, পিতা ও পুত্রে, মাতা ও সন্তানে এবং আত্মীয় ও আত্মীয়ে যে প্রীতিমধুর সহজ প্রাণের সম্পর্ক, এমনটি আর কোথায়? কতকগুলি বিশেষ ধরণের ব্রত-পার্ব্বণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুর পারিবারিক জীবনের অন্তর্নিহিত এই সৌন্দর্য্যের চিত্রটি আমরা দেখি। "বাস্তুপূজা," "পতিপূজা," "পিতৃপূজা," "মাতৃপূজা" "মায়ের ব্রতচর্য্যা," "ভ্রাতৃসম্বর্দ্ধনা," "গুরুপূজা,"—এ কয়টি বিশিষ্ট উপ-শিরোনামার ভিতর দিয়ে সমগ্র বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যে সকল ধর্ম্মীয় ব্রত-পার্ব্বণের নাম উল্লিখিত হবে তা শুধু কুমারী বা সধবাদের জন্যই নয়—পরন্ত নানা স্তরের মানুষের জন্যই। কোনটিতে হয়তো কুমারী, সধবা, বিধবা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মেয়েরাই অধিকারিণী, কোনটির অনুষ্ঠান হয়তো সধবা এবং বিধবারা মিলিত ভাবে করেন, কোনটিতে

হয়তো কেবল পুরুষদের অধিকার, আবার কতকগুলি নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য। কোন্‌টি কার জন্য, কেন এবং কখন অনুষ্ঠিত হয়, তা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানবো।

বাস্তুপূজা

আদর্শ পারিবারিক জীবনে ব্রতপার্ব্বণের প্রভাবের বিষয় আমরা আলোচনায় ব্রতী। আদর্শ পরিবারকে ধারণ করতে হ'লে প্রথমেই চাই একটি আদর্শ বাস্তু। আদর্শ বাস্তু অর্থে—যেখানে কোন বিঘ্ন, বিপদ বা অমঙ্গল নেই এমন একটি বাস্তু। বাস্তু বা গৃহ নিয়েই গৃহস্থ। বাস্তুনির্ম্মাণের নানা নিয়ম ও আচার শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেছেন। সে সকল নিয়মে বাস্তুর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যোপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, মুক্ত আলো-বাতাস পাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং আরো অনেক কিছুই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা গৃহস্থের পক্ষে একান্ত হিতকর। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও গৃহে যখন নানা অশান্তি, উপদ্রব ও অমঙ্গল দেখা দেয়, তখন ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ গৃহশান্তির জন্য বিবিধ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে থাকেন। প্রায়শঃ **শান্তিস্বস্ত্যয়নের** ব্যবস্থা করা হয়। চণ্ডীপাঠ বা কোনও বিশেষ দেবপূজার বিধানও দেওয়া হয়ে থাকে। **বাস্তুরাজ** বা **বাস্তুদেবতার** পূজাও দেওয়া হয়। কারণ, বাস্তুরাজ বা বাস্তু-দেবতাই প্রকৃত পক্ষে বাস্তুকে নিত্য রক্ষা করেন। তাঁর পূজাটি বার্ষিকী হিসাবেই যথাসময়ে দিতে হয়।

বাস্তুরক্ষায় যেমন বাস্তুদেবতা, গ্রামরক্ষায় তেমনি **গ্রাম্যদেবতা**। গ্রাম নিরুপদ্রুত না হলে গৃহ বা বাস্তুর নিরাপত্তাও সম্ভব নয়। কেন না, প্রতিটি পরিবার বৃহত্তর গ্রাম্য জীবনেরই এক অংশবিশেষ। সমগ্র ভাবে গ্রামে যদি শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে, তবে সেই সুস্থ পরিবেশেই প্রতিটি পরিবার আত্মোন্নতির পূর্ণ সুযোগ পায়। এজন্য গ্রামের শান্তির কথাও ভাবতে হয়। গ্রাম্য দেবতার পূজার বিধান এজন্যই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। শাস্ত্র বলেন—ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে পরিবারের স্বার্থ বড়, পরিবারের স্বার্থের চেয়ে গ্রামের স্বার্থ বড়, গ্রামের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় এবং সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থের চেয়েও যা বড় তা হলো আত্মোপলব্ধি। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থের জলাঞ্জলি —হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন।

"ত্যজেদেকং কুলস্বার্থে গ্রামস্বার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্বার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥"

আত্মত্যাগের এ ক্রম ব্রতোৎসবের ভিতর দিয়ে কি ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা আমরা দেখেছি এবং আরো দেখ্‌বো। ত্যাগের ভিত্তিতেই ভারতে ব্যক্তির জীবন গঠন, ত্যাগের ভিত্তিতেই এখানে পারিবারিক জীবনের সফলতা

লাভ। সেই পরিবার গ্রামের স্বার্থের জন্য নিজ স্বর্থ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। বাস্তুরাজের পূজার পর তাই তাকে গ্রাম্যদেবতার সমীপেও নতি স্বীকার করতে হয়। পরে আমরা দেখ্‌বো—জনপদের স্বার্থে দেশের জনগণ গণদেবতার পূজায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সমুদয় ঐহিক কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সমাপনের পর অবশেষে চূড়ান্ত নিবৃত্তির জন্য পরমাত্মার শরণ গ্রহণ ক'রে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন।

পতিপূজা

একটি নিরাপদ গৃহে একটি আদর্শ পরিবার প্রথম জন্ম লাভ করে বিবাহানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। গৃহিণী ঘরে এলেই প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ হন গৃহ-স্থ। পতি-পত্নীকে নিয়েই সংসারজীবনের সূত্রপাত। ভারতবর্ষে বিবাহ এক ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান। বিবাহ এদেশে চুক্তি নয়—আত্মিক বন্ধন। এ বন্ধন চির-অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দু'টি আতমার মিলন ঘটানো হয় ব'লেই এদেশে দাম্পত্য জীবন অতি পবিত্র—দাম্পত্য প্রণয়ও অতি গভীর ও মধুময়। পতির প্রতি পত্নীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা ও অনুরাগ এ দাম্পত্য প্রণয়কে স্বর্গীয় সুষমায় বিমণ্ডিত করেছে। পতিই পত্নীর সাক্ষাৎ দেবতা। পতিসেবাই পত্নীর পরম ধর্ম্ম। পতির কল্যাণে পত্নী নিত্য ব্রতপরায়ণা। এই হলো ভারতের নারীধর্ম্মের মহিমোজ্জ্বল আদর্শ।

পতির কল্যাণে হিন্দুর ঘরের সাধ্বী ললনাগণ যে সকল ব্রতের আচরণ ক'রে থাকেন, তন্মধ্যে **সাবিত্রীব্রত** সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। রাজা অশ্বপতির কন্যা তপস্বিনী সাবিত্রী যমবন্ধন থেকে পতি সত্যবানকে মুক্ত করার জন্য প্রথম এ ব্রতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অপরাজেয় স্বয়ং যমরাজও সাবিত্রীর পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার নিকট হার মেনেছিলেন। সাবিত্রী হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাই সাবিত্রীব্রতের আচরণেও তাদের গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়।

এর পরই **রুক্মিণী দ্বাদশী ব্রতের** নাম করা যায়। অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা রাজা যযাতিকে পতিরূপে বরণ করেন। কিন্তু, রাজা যযাতির দেবযানী হতে ভয় ছিল। তাই শর্ম্মিষ্ঠা পতির প্রকাশ্য ও প্রগাঢ় ভালবাসা থেকে বঞ্চিতা ছিলেন। পতিবিচ্ছেদের এ দুঃখ দূরীকরণের জন্যই তিনি রুক্মিণীসহ রুক্মিণীনাথের যুগলমূর্ত্তির আরাধনা করেন। তাতে স্বামীর অকুণ্ঠ ভালবাসা তিনি অর্জ্জন করেন এবং যোগ্য পুত্র সন্তান ও নিজের স্থির যৌবন লাভপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হন। **তালনবমী ব্রতে** গন্ধপুষ্পাদি উপচারে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ক'রে অতঃপর পতিপূজাও করতে হয়। তালের পিঠে তৈরী ক'রে দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত নিজ পতিকে ভোজন করিয়ে তবে ব্রতিনী নিজে ভোজন করেন। এ ব্রত ক'রে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের পরম আদরিণী হন।

উমা-মহেশ্বর ব্রতে হর-পার্ব্বতীর পূজা বিধেয়। সতীশিরোমণি অনসূয়া রামপ্রিয়া সীতা ঠাকুরাণীকে এ ব্রতের উপদেশ দেন। এ ব্রতের ফল এই—বালবৈধব্য হয় না। বালবৈধব্য নারীজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। হর-পার্ব্বতীর মধ্যে যেমন নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, নারীও পতির সঙ্গে সেই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি কামনা করেন। ব্রতকথায় পতির প্রতি পত্নীর শোভন আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যৌবনগর্ব্বিতা কোন নারী যেন স্বামীর প্রতি বিরূপা ও রুষ্টভাষিণী না হন। যে সকল মুখরা, প্রগল্‌ভা ও দুর্ব্বিনীতা নারী স্বামীকে মানে না, কর্কশ ভাষণে তাঁর অন্তঃকরণকে ক্ষত-বিক্ষত করে, সে নারীর জীবনেই তো নেমে আসে দুর্ভাগ্যের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ।

পতির মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ুঃ সহ নিজের সৌভাগ্য ও অবৈধব্য কামনা নিয়ে কতকগুলি লোকায়ত ব্রতও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে **এয়োসংক্রান্তি ব্রত** ও **নিৎসিন্দূর ব্রতের** নাম করা যায়। উভয় ব্রতেই ভাগ্যবতী ও পতিপরায়ণা এয়োদিগকে আমন্ত্রণ ক'রে গৃহে আনা হয়। অতঃপর পদপ্রক্ষালন, অলক্তরঞ্জন, কেশপ্রসাধন, সিন্দূরাঙ্কন, প্রণাম, পরিধেয় ও ভোজ্যদান প্রভৃতির দ্বারা তাঁদিগকে পূজা করতে হয়। সাধ্বীদিগের এবম্বিধ পূজার দ্বারা তাঁদের আশীর্ব্বাদ লাভ তো হয়ই, অধিকন্তু তাঁদের পূত জীবনাদর্শ অনুসরণ ক'রে ব্রতিনী নিজ চরিত্রকেও সুন্দর, সুশোভন, সৌভাগ্য-দীপ্ত, পতিনিষ্ঠ ও আদর্শপরায়ণ ক'রে গড়ে তুলতে চান। পতির কারণে অনুষ্ঠিত এ সকল পৌরাণিক ও লোকায়ত ব্রতের মধ্য দিয়ে পতির প্রতি পত্নীর প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সেবা, আনুগত্যের ভাবটি যেমন উত্তরোত্তর প্রগাঢ় হয়, তেমনি পত্নীর এই ঐকান্তিকী পতিনিষ্ঠা পত্নীর প্রতিও পতির অনাবিল প্রেম ও ভালবাসা উদ্রিক্ত করে। এ ভাবেই তো দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। হর-পার্ব্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রুক্মিণী-রুক্মিণীনাথ কোথায় থাকেন জানি না। কিন্তু, ভারতের আদর্শনিষ্ঠ দাম্পত্য জীবনের ভিতর সেই যুগলমূর্ত্তির প্রতিভাস আজো কি আমরা ঘরে ঘরে দেখতে পাই না? সাবিত্রী, উমা, রুক্মিণী, সীতা, অনসূয়া, শর্ম্মিষ্ঠা, সত্যভামা কেবল পুরাণোক্ত ব্রতের কথায় নয়—হিন্দুর সংসারে বাস্তব মূর্ত্তি নিয়ে তাঁরা নিত্য বিরাজমানা।

পিতৃপূজা

শাস্ত্র বলেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" ভার্য্যা গ্রহণ দৈহিক ভোগ-প্রবৃত্তির অনলে যথেচ্ছ ইন্ধন যোগাবার জন্য নয়—ভক্তিমান্, কীর্ত্তিমান্, মেধাবী, বীর্য্যবান্ ও কৃতী সন্তানের জন্মদানপূর্ব্বক পিতৃঋণ পরিশোধার্থেই পতির যোগ্যা পত্নী গ্রহণ। সন্তান উৎপাদন যেমন পিতা-মাতার এক গুরুতর দায়, তেমনি পিতা-মাতার প্রতি অবিচল ভক্তিও সন্তানের পরম কর্ত্তব্য।

পত্নীর কাছে পতি যেমন দেবতাস্বরূপ, সন্তানের কাছে পিতা-মাতাও তেমনি। শ্রুতির আদেশ—"পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব।" হিন্দুধর্ম্মের দু'টি ধারা—দেবপূজা ও পিতৃপূজা।

জীবিত পিতা-মাতার সেবা ও সন্তোষবিধান এবং মৃত পিতা-মাতা ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দু-ই পিতৃপূজা। পিতৃপূজার দ্বারাই সকল দেবতা প্রীত হন, হিন্দুধর্ম্মে এমন উক্তিও দেখা যায়। পিতৃপূজার সেই সাধারণ মন্ত্রটি এই—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বলা হয়েছে—পিতাই, স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতৃসেবাই পরম তপস্যা; পিতা প্রসন্ন হ'লে সমস্ত দেবতারাই সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যত্যাগী হয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হন, মিথিলা নগরের কোনও এক ধর্ম্মব্যাধ পিতা-মাতার সেবা ক'রেই অক্ষয় ধর্ম্ম অর্জ্জন করেন, —এরূপ অসংখ্য প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ভারতের শাস্ত্র ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবে সে সব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

পিতৃপূজার কথা বল্‌ছিলাম। মৃত পিতা-মাতার প্রেতত্বমোচনের জন্য মাসিক এবং বার্ষিক সপিণ্ডীকরণের শাস্ত্রীয় বিধান আছে। সামর্থ্যভেদে তিলকাঞ্চন, বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ দান প্রভৃতি নানা প্রকার শ্রাদ্ধের উপদেশ দেখা যায়। গয়াতে পিণ্ডদানের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়েছে। প্রতি বর্ষে পিতৃপক্ষ উপলক্ষ্যে প্রত্যহ পিতৃতর্পণ অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ অনুষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি হিন্দুধর্ম্মে এক সাম্বৎসরিক বিশেষ পার্ব্বণে পরিণত। বস্তুতঃ 'পার্ব্বণ' শব্দটির দ্বারা শ্রাদ্ধাদিকেই বিশেষ ভাবে বোঝানো হয়।

পিতৃতর্পণের উদ্দেশ্য ও বিধান কি? এতে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উৰ্দ্ধে
সপ্তপুরুষের মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে তিলোদক তো দিতে হয়ই, অধিকন্তু সপ্তদ্বীপ-
নিবাসী অতীত কোটী কুলের পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যেও অনুরূপ পূজার অর্ঘ্য
নিবেদন করতে হয়। অত্রি-অঙ্গিরা-মরিচ্যাদি সপ্তর্ষির উদ্দেশ্যে, সনক-সনন্দ-
সনাতনাদি সপ্তমুনির উদ্দেশ্যে, শান্তনুনন্দন, বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেবের
উদ্দেশ্যে এবং দেব-যক্ষ-নাগ-গন্ধর্ব্বাদি থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রুর সর্প ও খগাদি
পর্য্যন্ত যে সকল নিরাহারী স্থলচর, জলচর বা আকাশচর জীব আছে, তারা
পাপে বা ধর্ম্মে যাতেই রত থাকুক, তাদের তৃপ্তির জন্য তাদের উদ্দেশ্যেও
সমভাবে তিলোদক উৎসর্গ করতে হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে
তৎসৃষ্ট তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত কাউকে বাদ দেওয়া হয় না। পিতৃশ্রাদ্ধ ও
পিতৃতর্পণের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়। যথাঃ—

(১) শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপূজার আন্তরিকতা দেখে অন্য ব্যক্তিরাও জীবিত

পিতা-মাতাকে ভক্তি ও সেবা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। অর্থাৎ, এতে সাধারণ ভাবে সমাজে পিতৃমাতৃভক্তির ভাবটি পরিপুষ্টি ও পরিপ্রসার লাভ করার সুযোগ পায়।

(২) পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণের মাধ্যমে অতীত পিতৃপুরুষের ত্যাগ-তপস্যা, শৌর্য্য-বীর্য্য, উদারতা, মহত্ত্ব, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বদেশভক্তি প্রভৃতি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ ক'রে আমরাও আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির মার্গে পরিচালিত করার সুবিধা পাই।

(৩) পিতৃপুরুষপরম্পরাক্রমে যে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী আমরা, সেই ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের ভাবটিও পিতৃশ্রাদ্ধাদির ভিতর দিয়ে আমাদের ভিতর জাগ্রৎ হয়।

(৪) "আমরা আর্য্য ঋষির সন্তান"—এই গৌরববোধের উদ্রিক্তি আমাদিগকে অনেক হীনতা, পরাভব, স্খলন ও নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করতে পারে। শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মধ্য থেকে এও এক পরম লভ্য।

(৫) বিশ্বের সকলের উদ্দেশ্যে তিলোদক উৎসর্গের মধ্য দিয়ে সর্ব্বজীবের প্রতি এক উদার ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি খুলে যায়। ব্রহ্মা থেকে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উচ্চাবচ সকল বস্তুর ও সকল প্রাণীর সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রৎ হয়ে এক পরম সাম্যে ও পরম জ্ঞানে সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কেবল স্বাজাত্যবোধ নয়, এতে বিশ্বাত্মবোধের উন্মেষের সম্ভাবনাও অতি উজ্জ্বল। এই বিশ্বাত্মবোধই তো হিন্দুধর্ম্মসাধনার চরম লক্ষ্য—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই এর অধিকারী।

মাতৃপূজা

পিতৃতর্পণের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে পিতা এবং পিতৃপুরুষের কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মায়ের কথাটা তত প্রকাশ পায় নি। কিন্তু, মাতৃপূজার প্রসঙ্গটি আরো বেশী ক'রে ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ, বিশেষ দিক থেকে বিচার করলে মা যে পিতার চেয়েও বড়। স্বয়ং মনু বলেছেন—

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥ ২।১৪৫

দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্য্য অধিক, এক শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা অধিক, সহস্র পিতার চেয়ে মাতার গৌরব অধিক। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর মাতৃভক্তিও জগতে অতুলনীয়। তাঁরই শ্রীমুখের বাণী—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ হয়ে এলে রাবণ বধের পর মিত্র

বিভীষণ তাঁকে লঙ্কার রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই তখন জননী ও জন্মভূমির জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁরা লঙ্কার রাজভোগ প্রত্যাখ্যান ক'রে মাতা ও মাতৃভূমি দর্শনে ধাবিত হন। মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বনচারী হয়েছিলেন শ্রীরাম, তাই তিনি অনায়াসে সকল দুঃখ ও দুর্দ্দৈব জয় করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরাও ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। মায়ের আদেশে তাঁরা রাক্ষসের মুখেও যেতে প্রস্তুত, এক পত্নীকে পাঁচ ভাই মিলে বিবাহ করার মত অসম্ভব ও অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সাধনেও তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত নন। পক্ষান্তরে, দুর্য্যোধন গান্ধারীর ন্যায় ধর্ম্মশীলা জননী পেয়েও তাঁর হিতবাণী পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য করেছে। মাতাকে মান্য ক'রে পাণ্ডবগণ জয়ী, কিন্তু মাতৃবাক্য লঙ্ঘন ক'রে কৌরবেরা পরাজিত ও বিনষ্ট। বস্তুতঃ, মায়ের মত ধন জগতে আর কি আছে? এমন মায়ের পূজা যে করে না, সে নরাধম। জীবিতা জননীর সেবা-ভক্তি করা প্রত্যেক সন্তানের পরম কর্ত্তব্য। মাতৃবিয়োগের পরও তাঁর প্রতিকৃতিতে প্রত্যহ শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করতে হয়। হিন্দুসমাজে মাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধবিধান আসলে মৃতা জননীর পূজা বিশেষ। মাতৃমহিমা স্মরণপূর্ব্বক ভারতে এক মাতৃতীর্থের জন্ম হয়েছে, তার নাম মাতৃগয়া। গুজরাটের অন্তর্গত সিধপুরে ঐ তীর্থটি অবস্থিত। সেখানে বিশেষ ভাবে মতৃ-উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করা হয়।

মায়ের ব্রতচর্য্যা

মায়ের এত গৌরব কেন? কারণ, সন্তানের জন্য জননী তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দেন। মায়ের মমতা, মায়ের বাৎসল্য, সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ ও দুঃখ বরণের কোনও তুলনা নেই। জননীই সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সন্তানের হিতে মায়েরা আজীবন ব্রতচারিণী। মায়েদের সেই ব্রতচর্য্যার বিবরণ সধবাব্রত-রহস্য আলোচনা কালে আমরা দিয়েছিলাম। এখানে আরো অনেক কথা বল্‌তে হবে।

ষষ্ঠীব্রত এবং মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কথা নিশ্চয়ই আমাদের স্মরণে আছে। কেবল লোকায়ত ব্রতের বিবরণই আমরা জেনেছিলাম। কিন্তু, পৌরাণিক ষষ্ঠীব্রত বা পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কথা আলোচনা করা হয় নি। এখানে সে আলোচনার সুযোগ বিদ্যমান্।

সন্তানের প্রতি জননী সর্ব্বদাই অসীম মঙ্গলময়ী। তাঁর মঙ্গলভাবনাই অসহায় সন্তানের তুষ্টি ও পুষ্টি। জননীর এই মাঙ্গলিক ভাবনানিচয় বাস্তব রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মঙ্গলচণ্ডী বা মঙ্গলবার ব্রতের ভিতর দিয়ে। সন্তানের মঙ্গল বিধানই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে ব্রতের জন্য মঙ্গল বারটি বেছে

নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মাতৃত্বের অতুলনীয় মাধুরীই যেন এ সকল ব্রতের প্রাণ। তাই গর্ভধারিণী মায়েরা বিশ্বজননী চণ্ডীর উপাসনায় নিরতা হন, যিনি "যৈষা ললিতকান্তাখ্যা" * ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতা।

এতে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিফলন তাঁদের স্বকীয় মাতৃত্বের উপর আপতিত হয়। বিশেষতঃ সন্তানের চূড়ান্ত মঙ্গলের জন্য সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলা বিশ্বজননীর শরণাগতি ভিন্ন আর উপায়ই বা কি? ব্রতকথায় পাওয়া যায়—মঙ্গল বারে এই জয়চণ্ডীর ব্রত ক'রে অঙ্গরাজপত্নী সুনীতি বেণ নামক এক পুত্রলাভ করেন। বেণ প্রজাপীড়ক ও দ্বিজদ্বেষী। ফলে ব্রাহ্মণের অভিশাপে সে ভস্মীভূত। পুত্রশোকাতুরা জননীর প্রাণে শান্তি নেই। তিনি চান—নূতন সংশোধিত চরিত্র নিয়ে পুত্র আবার বেঁচে উঠুক। এই সঙ্কল্পে তিনি পুনরায় জয়চণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপন করতেই দেবীর কৃপায় বেণের পুনর্জ্জীবন লাভ। মায়ের তপস্যার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব যে তাতে কুপুত্রও সুপুত্র হয়, মৃত পুত্রও পুনর্জ্জীবন লাভ করে।

আমরা জানি—সন্তানের হিতকামনায় যে ব্রতটি সারা বাংলাব্যাপী বিপুল নিষ্ঠা, আগ্রহ ও ঔদার্য্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তা হলো আরণ্য ষষ্ঠী ব্রত। এ পুণ্য তিথিতে মাতৃগণের বাৎসল্যের অমৃতপ্রস্রবণ যেন স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। নিজের ছেলেই হোক, আর পরের ছেলেই হোক, যাকে তাঁরা সামনে পান তাকেই সমান স্নেহে গ্রহণ করেন এবং 'ষাট্ ষাট্" †এই অভয় মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে তাদিগকে প্রাণভরে শুভ আশীর্ব্বাদ দেন। এ পুণ্য তিথিতে জননীদের মধ্যে মাতৃধর্ম্মের যে অপার্থিব বিভূতি আমরা দর্শন করি, তার তুলনা নেই।

আরণ্যষষ্ঠী ব্রতের ফল কি? ভবিষ্যপুরাণ বলেন—এ ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে হিরণ্যরাজের পত্নী সুমনা বাণিজ্যার্থ দীর্ঘপ্রবাসগত পতিকে গৃহে ফিরে পান এবং বহুপুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী হয়ে কৃতকৃতার্থ হন। তিনি প্রতি বৎসরই এই কান্তারবাসিনী দেবীর পূজা করতেন। একদা তাঁর পাপাচারিণী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ লোভবশতঃ দেবীপূজার উদ্দেশ্যে আহরিত দ্রব্যের অগ্রভাগ উদরসাৎ করলে দেবী কুপিতা হয়ে অভিশাপ দেন—"তোর ছেলে হবে, আর

* যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

† ষষ্ঠী ষষ্ঠী

মরবে।” পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় কর্তৃক অভিশপ্ত এক বিদ্যাধর দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারে শীঘ্র মুক্তির জন্য ঐ অভিশপ্তা জননীর গর্ভ আশ্রয় করে।

একে একে ছয়বার সে মনুষ্যগৃহে জন্ম নেয় এবং জন্মিবামাত্রই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। মৃতবৎসা জননীর মনে সুখ নাই। সকলের নিকটই সে নিন্দিতা ও অপমানিতা। বান্ধবেরা তার উপর বিরূপ। মনোদুঃখে সে যায় বনে। তখন তার সপ্তম গর্ভ। সুমনা নিজ গৃহে বিবিধ উপচারে দেবীর আরাধনা করেন—নপ্তৃগণের পুনর্জ্জীবনার্থ। মাতা দোষযুক্তা হলে পিতামহীই মাতার স্থান অধিকার করেন। তিনি যে মায়ের চেয়েও বড় মা—ঠাকুর মা। গৃহস্থের সংসারে মায়ের আদরের চেয়ে ঠাকুরমার আদরই অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

যাক্, এদিকে গর্ভিণীর প্রসব হওয়া মাত্রই স্বর্গের বিদ্যাধরীরা আসে বিদ্যাধরকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু, বিদ্যাধর সমস্যায় পড়েন। কি করে তিনি প্রসবদুঃখিতা, অনাথা, আত্মীয়-পরিজনবিহীনা, একাকিনী বনবাসিনী জননীকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবেন? ইতিহাস ও পুরাণের বচন তো তিনি জানেন। যে পুত্র নিরপরাধা অনাথা জননীকে পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মানুশাসন অনুসারে সে নিশ্চিত নিরয়গামী হয়। গর্ভধারণ ও পোষণের জন্য জননী গুরু অপেক্ষাও গরীয়সী—“গর্ভধারণপোষাভ্যাং জননী হ্যধিকা গুরুঃ।” দোষযুক্ত হলে গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বান্ধবকে বরং পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাতা ও ভগিনীকে কদাপি নয়—“মাতরং ভগিনীঞ্চাপি সদোষমপি ন ত্যজেৎ।” অসহায়া জননীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ বিদ্যাধরকে ভাবিয়ে তুলে। তিনি বিদ্যাধরীদিগকে বলেন—তোমরা যাও, আমি এখন যেতে পারছি না, তবে শীঘ্রই কোনও ছল আশ্রয় ক'রে যাব। জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, বিবাহে আমার বিশেষ ইচ্ছা পূরণ না হ'লেই আমি চলে যাব।” কিন্তু, বিদ্যাধরের আর যাওয়া হয় নি। মাতৃস্নেহে সে বাঁধা পড়ে যায়। বিদ্যাধরের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। বিশেষতঃ জননী ষষ্ঠীব্রত ক'রে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন—“মাতা ষষ্ঠীঞ্চ সম্পূজ্য প্রার্থয়েৎ সুতমঙ্গলম্।” এখানেও দেখি, জননীর ব্রতের পুণ্যফলেই সন্তান বেঁচে গিয়েছিল।

প্রসিদ্ধি আছে দৈত্যমাতা দিতি সন্তানদ্বাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করেন। মহর্ষি কশ্যপ স্বয়ং এই ব্রতের ফলকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন—“এতে সন্তান দেব-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব্বাদি সকলের অবধ্য হয়।” দেখুন না, ইন্দ্র দিতির গর্ভটিকে উনপঞ্চাশৎ খণ্ডে কর্ত্তন ক'রে ফেলেছিলেন। তথাপি গর্ভটি মরে নি।

ঊনপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত গর্ভ থেকে মরুদ্‌গণের জন্ম এবং দিতির গর্ভজাত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্থান লাভ করেন দেবপর্য্যায়ে। সেই থেকেই না কি সন্তানদ্বাদশী ব্রতের সূচনা। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রতের আরম্ভ, সমাপ্তি এক বছরে। প্রতি দিন করতে হয় না—প্রতি মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এক বার ক'রে করতে হয়। মোট বারো মাসে বারোটি ব্রত করণীয়।

নারীমাত্রেরই অন্তরে বহুযত্নলালিত এক প্রবল পিপাসা আছে—সে মা হতে চায়। এক জন দুজনের নয়—বহুর মা হতে তার সাধ। এই মাতৃত্ব লাভের জন্য তার কত না ব্রত, কত না তপস্যা। বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা জননীরা কার্ত্তিকেয় ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। উদ্দেশ্য—দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে **কুক্কুটী ব্রত** (এ'কে ললিতা সপ্তমী ব্রতও বলা হয়) করলে কখনো সন্তানবিচ্ছেদ হয় না এবং বহুসন্তানশালিনী হওয়া যায়। মৃতবৎসা দৈবকী এ ব্রত ক'রে সফলমনোরথ হন। নহুসপত্নী চন্দ্রমুখী এবং চন্দ্রমুখীর সখি মালিকাও এ ব্রত করেছিলেন। জন্মান্তরে চন্দ্রমুখী এ ব্রত বিস্মৃত হয়ে নবম বর্ষীয় একমাত্র পুত্রকে হারান। কিন্তু, মালিকা ব্রতাচরণ ভুলেন নি। তিনি আটটি দীর্ঘজীবী পুত্রের জননী হন। অনুতপ্তা চন্দ্রমুখীকে মালিকা কর্ত্তৃক অর্দ্ধ ব্রতফল দেওয়ায় এবং চন্দ্রমুখীও সখির উপদেশে পুনঃ ব্রতাচরণ করায় তাঁর ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়।

ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমীতে কুক্কুটী ব্রত, আর ঠিক তার পরের দিন অষ্টমী তিথিতে হয় **দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত**। দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থন কালে পর্বতসঞ্চালন বেগে বিষ্ণুর বাহু ও উরুর রোম ছিন্ন হয়ে তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রের তটদেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তা থেকেই দূর্ব্বার জন্ম। ঐ দূর্ব্বার উপর দেবতারা অমৃতভাণ্ড রেখেছিলেন। ফলে দূর্ব্বা হলো অজর অমর। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত কেন করা হয়? উদ্দেশ্য—দূর্ব্বার ন্যায় ক্ষয়হীন ও মৃত্যুহীন বংশবৃদ্ধি—"নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলম্।" মায়েরা দূর্ব্বার মত সন্তান-বৃদ্ধি কেন চান? আসল তত্ত্ব এই। মাতৃত্ব এমন এক বস্তু যা স্বল্পে সুখলাভ করে না, তা ভূমার মধ্যে আপন মহতী সত্তার অকপট প্রকাশ অনুভব করতে চায়। আমরা আগেও ইঙ্গিত দিয়েছি, গর্ভধারিণী জননীদের মধ্যেই বিশ্ব-মাতৃত্বের মহাভাব লুক্কায়িত। অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা চালিতা হয়েই তাঁরা বহুসন্তানবতী হতে চান। সত্য, সংযম ও ব্রতনিষ্ঠার দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি ঘট্‌লে মাতৃত্বের বিশ্বগ্রাসী উদার আদর্শের পরিস্ফুরণ তাঁদের ভেতর সচেতন ভাবেই ঘট্‌তে থাকে। সেই অবস্থায় মানুষ মাত্রকেই তাঁরা সন্তান জ্ঞানে ভালবাসতে পারেন। মাতৃধর্ম্মের সাধনার এই তো শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

ভ্রাতৃসম্বৰ্দ্ধনা

পিতা-মাতার শুদ্ধা কামনা থেকে গৃহ-সংসার বহু পুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ। আপত্তি না থাকলে কুক্কুটের মত বা দূর্ব্বার মতই হয়তো বংশ বেড়ে চল্‌লো। এতে পিতা-মাতার আনন্দ ও তৃপ্তি দু-ই আছে। কিন্তু, এতে নূতন সমস্যাও দেখা দেয়, পিতামাতার দায়িত্বও বহুগুণে বৃদ্ধি হয়। ঐ সন্তান-সন্ততিগুলির মধ্যে পরস্পর প্রেম, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি গড়ে দিতে না পারলে গৃহের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বা শৃঙ্খলা কোথায়? তাই আদর্শ পরিবারে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, ভগিনীর সঙ্গে ভগিনীর এবং ভাইয়ের সঙ্গে ভগিনীর সমপ্রাণতা থাকা খুবই প্রয়োজন। ভাই ও ভগিনী যেন একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দু'টি ফুল। একের সঙ্গে অন্যের অভিন্ন সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়।

আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে ভাইয়ের প্রতি ভগিনীর প্রীতি-ভালবাসা জ্ঞাপনের জন্য যে উৎসবটি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রিয় তা হলো 'ভাই ফোঁটা'। ভ্রাতৃগণকে ফোঁটার সঙ্গে ভোজ্য-বস্ত্রাদি দিয়েও সম্বৰ্দ্ধনা জানানো হয়। ভাইদের "যমের দুয়ারে কাঁটা" দিবার জন্য স্নেহশীলা ভগিনীদের কতই না আগ্রহ ও প্রযত্ন। সমগ্র উৎসবটি সুগভীর আন্তরিকতার রসে ভরপুর। কথিত হয়, যমী তাঁর ভ্রাতা যমকে সর্ব্বপ্রথম ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন। সেই জন্য ভাইফোঁটা যমের প্রিয় কার্য্য। ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যম প্রীত হন ব'লেই বোধহয় ভ্রাতৃগণের যমভয় থাকে না। এই পুণ্য উৎসবের দিনে কল্যাণময়ী ভগিনীদের ভ্রাতৃপ্রেমের রুদ্ধ ভাবাবেগ যেন সহসা মুক্তি পায়। প্রাণের সবটুকু শুভেচ্ছা ও ভ লোবাসা অকৃপণ ভাবে ঢেলে দিয়ে তাঁরা কামনা করেন—ভ্রাতৃগণের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, তাঁরা দীর্ঘজীবী হোন। আবার স্নেহমুগ্ধ ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের কাছেও এই পুণ্য মুহূর্ত্তটি বড় সুখের, বড় সৌভাগ্যের, বড় আনন্দের। "যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা" শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মৃত্যুহীন জীবনের সুদুর্লভ অমৃতপুলক যেন চকিতে তাঁদের মূলগত সত্তাকে নাড়া দিয়ে তোলে। বয়োজ্যেষ্ঠাই হোন বা বয়ঃকনিষ্ঠাই হোন, ভগিনীদের অভয় ও আশীর্ব্বাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলে নিয়ে তাঁরা ধন্য হন, কৃতকৃতার্থ হন।

ভাইয়ের জন্য ভগিনীর মঙ্গল কামনা কুমারীব্রতের ছড়ার মধ্যেও প্রায়ই আমরা দেখেছি। কোন "সতী লীলাবতী" "সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী" হতে চেয়েছেন; "বাপভাইয়ের হোক অশেষ মঙ্গল" ব'লে দেবতার কাছে কেঁদেছেন, শ্রীহরির চরণে "প্রেমানন্দ ভাই" চেয়েছেন; "বাপ-ভাই লক্ষেশ্বর" হোক কামনা করেছেন; "বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর, ভাই হয়েছেন রাজা" কল্পনা ক'রে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভে চেষ্টিত হয়েছেন—আরো কত কি। "ভাই-

ফোঁটার" উৎসবে ভ্রাতৃকল্যাণের এই প্রাণদীপ্ত ভাবনাগুলির এক প্রত্যক্ষ রূপ খুব সহজ ভাবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

অধুনা বহুল প্রচলিত না হ'লেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবেরই সহধর্ম্মী আর একটি ব্রত আছে, নাম—**"সন্ধ্যামণি ব্রত।"** সন্ধ্যামণি করে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রতিনী বলেন—"সাত ভাই-এর বোন যে।" চার বৎসর ব্রত পালনের পর পঞ্চম বর্ষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ভ্রাতা যখন বিবাহান্তে নববধূকে নিয়ে ঘরে আসেন, তখন ব্রতচারিণী ভগিনী সন্ধ্যায় ছাদে উঠে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখে ব্রত সাঙ্গ করেন। ভ্রাতার কল্যাণের সঙ্গে নিজের অবৈধব্যও (অর্থাৎ স্বামীর কল্যাণ) তাঁরা চেয়ে নেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার, ভগিনীর সঙ্গে ভগিনীর নাড়ির সম্বন্ধ। সুতরাং, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই স্বাভাবিক। দ্বেষের কোন প্রশ্ন উঠাই উচিত নয়। শ্রুতির আদেশ—

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষণ্মাস্বসারমুতস্বসা।
সম্যঞ্চ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥

[অথর্ব্ব, ৩৷৩০৷৩]

অর্থাৎ, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করবে না, ভগিনী ভগিনীকে দ্বেষ করবে না, সহব্রত ও সহমত হয়ে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ ভাবে বার্ত্তালাপ বা ব্যবহার করবে। বেদানুশাসনের বাস্তব সাধনা যেন মূর্ত্ত দেখতে পাই—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও সন্ধ্যামণি ব্রতের যথা প্রকল্পের মধ্যে ও কুমারীব্রতের একাধিক ছড়ার ছন্দে। ভ্রাতৃত্ব চেতনার এই সমুজ্জ্বল প্রকাশ গৃহের গণ্ডী ছাড়িয়ে সামাজিকতা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে এসে এক মহত্তর রূপ নিয়েছে ঝুলন পূর্ণিমার **"রাখী বন্ধন উৎসব"** এবং বিজয়া দশমীর **"কোলাকুলি"**র মধ্য দিয়ে। ভ্রাতৃত্বের সাধনা কেবল গৃহকোণে বন্দী হয়ে থাকার বস্তু নয়—বৃহত্তর জগতে সে আপন বিশ্বোদার মহিমার সার্থক প্রকাশ দেখতে চায়। জগতের সকল মানুষই তো ভাই ভাই। বিরোধ করা মূর্খতা।

গুরুপূজা এবং ব্যক্তিজীবনে ও পারিবারিক জীবনে তার প্রভাব

বাগানে ফুল ফোটাতে হ'লে এবং সেই ফুলরাশি নিয়ে মালা গাঁথতে হ'লে যেমন প্রয়োজন হয় এক জন সুদক্ষ মালীর, তেমনি ব্যক্তির জীবনে নৈতিক, ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ-প্রকাশ এবং ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে একটি আদর্শ পরিবারের গঠনের পিছনেও চাই এমন এক মহাব্যক্তিত্বের সাহচর্য্য, যিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে বহু উর্দ্ধে। তিনি কে? ভারতবর্ষে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু। এরূপ গুরুর শিক্ষা, শক্তি, আশীর্ব্বাদ ও অনুশাসনের গুণেই এদেশে একদা ব্যক্তির জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠ্‌তো। গার্হস্থ্য

জীবনেও আর্য্যসন্তানগণ শ্রীগুরুগৃহ থেকে অগ্নি এনে নিজ গৃহে স্থাপন করতেন এবং সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীগুরূপদিষ্ট পন্থায় জীবন যাপন করতেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনেও পুনঃ শ্রীগুরুর শরণাগতিই প্রধান সম্বল। এই ভারতে আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্ম গুরুগৃহে—যে সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমরা তা গুরুপরম্পরাক্রমে আমরা পেয়েছি। যে সকল ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণের কথা আমরা আলোচনা করছি, সেগুলির প্রবর্ত্তক, প্রচারক ও রহস্যব্যাখ্যাতা হলেন তত্ত্বজ্ঞ ও সাধনসিদ্ধ গুরু। শ্রীগুরুর শিক্ষাগুণেই পারিবারিক জীবনে স্নেহ-শ্রদ্ধার পারস্পরিক সম্পর্কটি অধিকতর গভীর মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠ্‌তে পারে। জীবনের ঘনঘোর অন্ধকারে শ্রীগুরুই আলোকবর্ত্তিকা প্রদর্শন করেন, দুঃখ ও বিপদে তাঁর সুশীতল পদ-ছায়ায় আমরা শান্তি ও আশ্রয় পাই, নানা জটিলতার সমস্যায় পড়ে যখন আমরা একান্ত দিশেহারা তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সমাধানের সরল সূত্র বের ক'রে দেন। তিনি আমাদেরই একজন—পরম সাধনার ধন। অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধপীঠভূমি ভারতবর্ষে গুরুকরণপ্রথা আজো অব্যাহত। তাঁর আসন সকলের উপরে। শ্রীগুরুকে নিয়ে উৎসবের দিন আজো ফুরিয়ে যায় নি। বিভিন্ন দেবতার পূজারাধনার জন্য যেমন এক একটি বিশেষ তিথি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তেমনি গুরুপূজা ও গুরুসেবা নিত্যকৃত্য হ'লেও বিশেষ ভাবে শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি ও পূজা নিবেদনের জন্য বৎসরে এক বিশেষ তিথি স্থির করা হয়েছে। সে তিথিটি হলো আষাঢ়ী পূর্ণিমা—এ'কে গুরুপূর্ণিমা তিথি ও বলা হয়। এটি গুরুপূজার এক পুণ্য মুহূর্ত্ত। এর প্রকৃতি সর্ব্বভারতীয়। ভারতের সকল প্রান্তের সকল সম্প্রদায়ের প্রায় সকল আশ্রম, মঠ, মন্দির ও গুরুপীঠেই এ উৎসব গভীর নিষ্ঠা ও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দীক্ষিত গৃহী ভক্তও এ তিথি স্মরণপূর্ব্বক সাধ্যমত নিজ গৃহে শ্রীগুরুপূজার আয়োজন ক'রে থাকেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উপর শ্রীগুরুর প্রভাব অপরিসীম। সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের ধর্ম্মীয় বিধি-বিধানও এক কালে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছ থেকেই এসেছিল। ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় চিন্তার সামগ্রিক দিকটিও তাঁরাই ভারতীয় আর্য্যহিন্দুগণের সম্মুখে নানা উপায়ে তুলে ধরেছিলেন। সে সকল উপায়ের মধ্যে ব্রতপূজাদির মাধ্যম অন্যতম।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রতোৎসবে জাতিগঠন, সমাজোন্নয়ন ও রাষ্ট্রচিন্তার নানা দিক

একটি একটি ফুল্ল কমল একত্র গেঁথে নিয়ে দেবপূজার জন্য মাল্য রচনা করা হয়। আবার এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মাল্য একত্র সংযুক্ত করলে তার আয়তন এত বিশাল হ'তে পারে যে, তার দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে গোটা মন্দির বা দেবাঙ্গনটিকেই ফুলের হাসিতে ভরে তোলা যায়। ঠিক সেইরূপ কতকগুলি আদর্শ মানুষের সমবায়ে যেমন একটি আদর্শ পরিবার গড়ে উঠে, তেমনি আবার অসংখ্য আদর্শ পরিবারের সমবায়ে একটি আদর্শ সমাজের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এরূপ কতকগুলি আদর্শ সমাজ সংহতিবদ্ধ হ'লে দেশজোড়া বিরাট আদর্শ জাতির গঠন সহজসাধ্য হয়। পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে, আমাদের ঘরে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের যে সকল অনুষ্ঠান হয় সেগুলি শুধু ব্যক্তিগঠনেই সাহায্য করে না, তাদের এক সমষ্টিমুখী গতিও আছে। পারিবারিক জীবনের ঐক্যবন্ধনের ভিতরে সেই সমষ্টিচেতনার প্রথম সার্থক রূপটি আমরা দেখেছি। এবার আরো এগিয়ে যাব। ব্রতোৎসবের ভিতর সামাজিক কল্যাণ, জাতির সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের যে সকল ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা আবিষ্করণে চেষ্টিত হব।

পুনরুক্তি হ'লেও একটি কথা পাঠকগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভারতের সনাতন অন্তঃপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে ধর্ম্মাশ্রয়ে। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার মৌলিক প্রশ্নকে উপেক্ষা ক'রে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রগঠনের কল্পনা করা যায় না। ব্যাবহারিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য শ্রান্তিহীন শ্রমবিনিয়োগে ভারতীয় হিন্দুর কোনও কুণ্ঠা বা দীর্ঘসূত্রতা কদাপি দেখা যায় নি। হিন্দু কখনো ইহবিমুখ নয়। স্বার্থ ও শোষণ তার ধর্ম্মীয় শিক্ষার ভিতরে নেই। বরং ধর্ম্মবুদ্ধিই হিন্দুকে তার কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা জাগিয়েছে, তাকে স্বার্থ ও শোষণবৃত্তি থেকে নিরস্ত করেছে, প্রতিবেশীকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, আর্ত্তের সেবায় প্রণোদিত করেছে এবং দেশ ও সমাজের প্রতিপালনের জন্য আত্মত্যাগের বীর্য্য দান করেছে। জাতীয় সংহতি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ—জাতীয় জীবনের সকল চিন্তা ধর্ম্মাশ্রিত হয়েও যে কত নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা যায়, ভারতবর্ষ তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। নানা শ্রেণীর ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণের মধ্যে সেই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। আলোচনার গভীরে প্রবেশ করলেই তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।

জাতীয় সংহতি

কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প, প্রতিরক্ষা—জাতীয় জীবনের নানা দিক আছে। কিন্তু, সকলের আগে চাই সংহতি। সংহতি না হ'লে জাতীয় জীবনের কোন কাজই সফল হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম্ম এই সংহতির মর্ম্ম উপলব্ধি করেছে। হিন্দুর অন্যতম উপাস্য গণেশ—এই সংহতির দেবতা। তিনি সমগ্র জনগণের প্রতিভূ। জনতাই তাঁর স্বরূপ। এই গণদেবতার পূজা চাই সর্ব্বাগ্রে। তাঁর পূজা না হ'লে কোন দেবতার পূজাই হয় না। এর ভিতরে পুরোপুরি গণতন্ত্রের শ্লোগানেরই বজ্রধ্বনি।

ইন্দ্রাদি দেবতারা মিলিত হয়ে এই বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালন করছেন। এক এক দেবতা এক একটি 'পোর্ট ফলিও' নিয়ে আছেন। সরস্বতী বিদ্যায়, লক্ষ্মী ধনে, বাণিজ্যে ও কৃষিতে, অন্নপূর্ণা খাদ্যনিয়ন্ত্রণে ও খাদ্যবণ্টনে, বিশ্বকর্ম্মা শিল্পে, যম বিচারে, ইন্দ্র পূর্ত্তকর্ম্মে, মা ষষ্ঠী শিশুকল্যাণে, ব্রহ্মা সৃজনে, বিষ্ণু পালনে, মহেশ্বর সংহারে, কুবের ধনকোষে, কার্ত্তিকেয় প্রতিরক্ষায়, শীতলাদি দেবতা আরোগ্য এবং গ্রাম্য মাকাল দেবতা মৎস্য-বিভাগের অধিষ্ঠাতৃত্ব পদে নিয়োজিত। কিন্তু, কার সমর্থনে? গণদেবতার পূজার বিধান সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট ক'রেই ভারতের আর্য্য ঋষিরা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেয়েছেন। গণদেবতা যতক্ষণ অনুকূল, ততক্ষণই সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি, তিনি উল্টে গেলেই সব পণ্ডশ্রম। দেবতারাও তাই গণদেবতাকে আগে খুশী রাখেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে গণপতি পূজনের বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়। তাদের অনুকরণে অধুনা গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতি অঞ্চলেও এ-পূজা বহুল অনুষ্ঠিত। একাদিক্রমে নয় দিবস পূজা হওয়ার পর অনন্তচতুর্দ্দশী দিবসে দশম দিনে উৎসব শেষ হয়। একটি সার্থক ধ্বনি জনগণকণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠে—"গণপতি, গণপতি, মোরিয়া, মোরিয়া!" গণদেবতার জয় ঘোষণার জন্যই এই ধ্বনি দেওয়া হয়ে থাকে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা

গণসংহতি ও গণসংযোগে যেমন গণেশ, জাতীয় প্রতিরক্ষার বীর্য্যসঞ্চারে তেমনি দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। আজকাল সাধারণতঃ বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীরাই সন্তান লাভের জন্য কার্ত্তিকেয় ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে থাকেন, তা পূর্ব্বে আমরা বলেছি। স্কন্দপুরাণেও কার্ত্তিকেয় ব্রতের উদ্দেশ্য সীমিত। সুভগ নামক ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্নী দক্ষিণা বিধিমতে কার্ত্তিকেয় ব্রতের আচরণ ক'রে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী পুত্র লাভ করেন। দেবর্ষি নারদের উপদেশে মৃতবৎসা জননী দেবকীও এ ব্রত করেন। তাতেই তাঁর অষ্টম গর্ভটি রক্ষা পায়, তিনি

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভাগবত সন্তান লাভ করেন—"কৃত্বা ব্রতং দেবকী চ শ্রীকৃষ্ণমলভৎ সুতম্।" বীর্য্যবান্ ও অপরাজেয় সন্তান লাভ কার্ত্তিকেয় ব্রতের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। কার্ত্তিকেয় জাতীয় প্রতিরক্ষার দেবতা—তিনি আমাদিগকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গের বীর্য্যদীপ্ত প্রেরণা দান করেন। আদর্শ সৈনিক গঠনে কার্ত্তিকেয়ের চরিত্র অনুধ্যানযোগ্য। কার্ত্তিকেয় দেশের প্রতিটি যুবকের আরাধ্য হওয়া উচিত।

শুধু কি দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়? বীর্য্য ও প্রতিরক্ষার প্রেরণা হিন্দুর অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, তত্ত্ব ও পূজার মধ্য দিয়েও আমরা লাভ করি। সমররঙ্গিণী কালী খড়্গধারিণী, মহিষাসুরহন্ত্রী দুর্গার দশকরে দশপ্রহরণ, ত্রিপুরান্তক শিব ত্রিশূল-পাশুপতধারী, মধুকৈটভবিনাশী বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর, রাবণারি শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কংসদর্পহারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র, পাপীর শাস্তা যমের হস্তে যমদণ্ড, বরুণের হস্তে পাশ—হিন্দুর উপাস্য দেবদেবীদের অধিকাংশই কোনও না কোন অস্ত্র ধারণ করেন এবং দৈত্য-দানব-রাক্ষস-অসুর বধ তাঁদের জীবনলীলা। বস্তুতঃ, হিন্দুর ধর্ম্ম—শক্তির সাধনা; হিন্দু—শক্তি ও বীর্য্যের উপাসক। দেশ, সমাজ, নারী, ধর্ম্ম রক্ষায় হাসিমুখে প্রাণ দানে যে ভয় পায় ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়, সে হিন্দুই নয়।

হিন্দু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট তিথিতে এ সকল বীর্য্যঘনমূর্ত্তি দেবদেবীর পূজোৎসবে প্রমত্ত হয়ে তাঁদের আশীর্ব্বাদে শত্রুঞ্জয়ী মহাশক্তি লাভে সমর্থ হতে পারে। দেবদেবীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রপূজার বিধানও আছে। অস্ত্রশস্ত্রপূজার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষায় ঐ অস্ত্রশস্ত্রাদির সদ্ব্যবহার শিক্ষা করতে হবে। এই তো বীর ভক্তের লক্ষণ। শুধু পুরুষকে নয়, নারীকেও হতে হবে বীরাঙ্গনা। তাঁকেও লাভ করতে হবে বিজয়—সর্ব্বজয়া ব্রতে নারী সেই কামনাই তো করেন, তিনি একটি সর্ব্বজয়ী জীবনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদ লাভ করতে চান। তবে সেখানে সেই জয় হয়তো শস্ত্রের দ্বারা নয়—শীলের দ্বারা। কিন্তু, তাই ব'লে শস্ত্রে তিনি অনধিকারিণী নন। তাই যদি হবে তবে হিন্দুর নারীদেবতা কেন শস্ত্রধারিণী?

শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মহাবীর পূজা। উত্তর ভারতের প্রতিটি ব্যায়ামের আখড়ায় এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইনিও একজন সৈনিকশিরোমণি। শক্তি ও ভক্তির সমন্বিত আদর্শ এঁর চরিত্রে মূর্ত্ত। পূর্ণ ব্রহ্মচারী তিনি। রামপ্রিয়া সীতার উদ্ধার সাধনের জন্য লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইনি যে অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা, সমরকুশলতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়েছিলেন সে কারণেই ইনি হিন্দুর নিকট চিরপূজ্য হয়ে আছেন। জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল জওয়ান নিয়োজিত, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় মহাবীর হনুমানের চরিত্রও আদর্শস্থানীয়।

শিক্ষা

চরকসূত্র বলে—'বিদ্যা বৃংহণানাম্' যা কিছু আমাদের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি আনে তন্মধ্যে বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব। বিদ্যার অনুশীলনকেই আমরা বলি শিক্ষা। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সকল শুভকর চিন্তাগুলিকে বলিষ্ঠ বাস্তব রূপ দিতে শিক্ষার অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষে বৈদিক কাল থেকেই শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মীয় সাধনার নিকট সম্বন্ধ। শিক্ষার আরম্ভ এবং শিক্ষার নিয়মতান্ত্রিক পরিসমাপ্তি দু-ই এদেশে ধর্ম্মীয় আচরণের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হতো। বস্তুতঃ, ভারতে শিক্ষা একটি ধর্ম্মীয় সংস্কার। শিক্ষাদান ও শিক্ষা অর্জ্জন দু-ই মহৎ ব্রতবিশেষ। ভারতের গুরুকুলগুলি পরিচালিত হতো ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের দ্বারা। তাঁরাই ছিলেন আচার্য্য বা অধ্যাপক'। **উপনয়ন, বেদারম্ভ** এবং **সমাবর্ত্তন**—দশবিধ সংস্কারের অন্ততঃ এ তিনটি প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষাজীবনের সঙ্গে একান্ত ভাবে সম্পৃক্ত। অবশ্য শিক্ষার কোনও শেষ নেই। গুরুকুল থেকে স্নাতক হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরও সারাটি জীবন ধ'রেই সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস বিধেয়। সমাবর্ত্তনকালে গুরু বা আচার্য্য স্নাতক শিষ্যকে সে উপদেশই দিয়ে দিতেন। যথা ঃ—"সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।" ইত্যাদি। অর্থাৎ, তাঁদের অনুশাসনের সার মর্ম্ম হলো—সত্য কথা বলবে, ধর্ম্ম আচরণ করবে, স্বাধ্যায় বা বিদ্যাচর্চ্চা বর্জ্জন করো না। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে হিন্দুদের ভিতর এত যে ব্রতচর্য্যার প্রয়াস দেখি তা বৈদিক যুগের ধর্ম্মাদর্শপুষ্ট শিক্ষানীতির গুণেই।

আজ সে ভারতীয় গুরুগৃহ আর নেই। কিন্তু, শিক্ষাজীবনের উপনয়নাদি ধর্ম্মীয় সংস্কারগুলি অদ্যাপি দ্বিজাতিগণের মধ্যে মাত্র লৌকিক প্রথা হিসেবে টিকে আছে। এ উপলক্ষ্যে সমর্থ গৃহস্থেরা ঘটা ক'রে উৎসবের আয়োজনও করেন, দেখ্‌তে পাই। সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে শিক্ষারম্ভের যে অনাড়ম্বর পবিত্র অনুষ্ঠান চালু আছে, তা হলো হাতেখড়ি।

বৈদিক গুরুকুল-শিক্ষাপদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটলেও ধর্ম্মীয় উৎসব থেকে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের মহতী প্রেরণা লাভের সুযোগ আজও আমরা হারাই নি। বাসন্তী পঞ্চমীতে **শ্রীশ্রীসরস্বতী** দেবী জ্ঞানসাধনার বিমল জ্যোতিঃপ্রভা নিয়ে আজিও প্রতি বর্ষে প্রতিটি বিদ্যায়তনে ও প্রায় প্রতিটি হিন্দুর ঘরে ঘটে, পটে বা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়ে তদীয় শুভাশীর্ব্বাদ দান করেন। এ উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্যার্থী ও বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে কত না উৎসাহ, কত না মাতামাতি, কত না জ্ঞানস্পৃহার শ্রদ্ধাপ্লুত শিহরণ! খুব ছোট্ট বেলার কথা মনে পড়ে। গ্রাম্য পুরোহিত সংস্কৃত ও বাংলার সংমিশ্রণে রচিত এক মন্ত্র পড়াতেন—

ত্বং ত্বং সরস্বতি নির্ম্মলবরণে
শিরে জঁটা, গজমতি হার,
* * *
লাগ্ লাগ্ বিদ্যা আমার কণ্ঠে লাগ্ ॥

তিনি হয়তো "ত্বং ত্বং"ই বল্‌তেন, কিন্তু শিশুকালে অতশত না বুঝে উচ্চারণ ক'রে বসেছি—"টং টং।" যখন মন্ত্রটাও ভাল ক'রে বল্‌তে পারি নি, তখনও সরস্বতী পূজায় কতই না আনন্দ ও উৎসাহ লাভ !

শিক্ষার প্রাণ স্বাধ্যায়ে। এই স্বাধ্যায়ের রীতিটা আমাদের নানা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে আজো বিদ্যমান। যেমন শ্রাদ্ধবাসরে মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব পাঠ, শ্রাদ্ধান্তে মৃতাত্মার কল্যাণার্থে রামায়ণ গান, ৺দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজাদি উপলক্ষ্যে বা গৃহের শান্তিকামনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কার্ত্তিক মাসভোর মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ, বৈষ্ণব মহোৎসবাদি উপলক্ষ্যে ভাগবতপুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যান, ৺শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিবপুরাণাদি পাঠ ও শ্রবণ, গীতাজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগীতার পূজা এবং পাঠ ও ব্যাখ্যান ইত্যাদি। ধর্ম্মোৎসবাদি উপলক্ষ্যে এ সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের যে নিয়ম চলে আসছে, তা লোকশিক্ষার সহায়ক রূপেই পরিকল্পিত ও প্রবর্ত্তিত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

সমাজসেবা

শিক্ষার কথা আমরা আলোচনা করেছি। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিদ্যার্থীর ভিতরে মানবীয় সদ্‌গুণাবলীর সম্যক্ বিকাশের দ্বারা তাকে সমাজের উপযুক্ত সেবক ক'রে গড়ে তোলা। সে হবে পর্ব্বতের মত উন্নত ও অচঞ্চল, পরশুর ন্যায় তীক্ষ্ণধার, আবার হিরণ্যের ন্যায় রত্নকল্প ; সে হবে মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি ; সে হবে মানুষের বন্ধু ও রক্ষক। আচার্য্য শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন—

"অশ্মা ভব। পরশুর্ভব। হিরণ্যমস্তৃতং ভব।"
"শিবো ভূঃ সখা চ শূর অবিতা চ নৃণাম্।"

ভারতীয় শিক্ষানীতির এ মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় নি। গুরুকুলের শিক্ষা লাভ ক'রে যাঁরা বেরিয়ে আসতেন, সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন পূর্ব্বক যশস্বী হতেন। সত্যই তাঁরা হতেন মানুষের বন্ধু ও রক্ষক। সমাজের অভাব-অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে সাধ্যানুসারে তা দূরীকরণের জন্য তাঁরা ত্যাগ ও সেবাদানে কুণ্ঠিত হতেন না। সমাজসেবা নিজেই এক সুমহৎ ব্রত। এই ব্রতনিষ্ঠা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের মধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি নানা প্রকার ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও আপন হিতচিকীর্ষু স্বরূপের সার্থক মূর্ত্তিটি মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার কথা ধরা যাক্।

এ পুণ্যানুষ্ঠানের উৎপত্তি কেবল কৃষির স্বার্থে নয়, সমাজসেবার প্রেরণাতেও। দারুণ নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপে পথশ্রান্ত পথিক ক্লান্তি অপনোদন করবে কোথায়? এ চিন্তাই কোন কোন মানবপ্রেমী মহাত্মাকে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করতো। এ সকল ছায়াসুশীতল পুণ্য তরুতলে আশ্রয় নিলে সত্যই ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে যায়। শুধু বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা নয়, জলকষ্ট নিবারণের জন্য কূপ-তড়াগাদি খনন, নিরাশ্রয় পথিককূলের জন্য পান্থশালা নির্ম্মাণ, নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিবার জন্য অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্ম-গুলি এ দেশে ধর্ম্মীয় আচারের সঙ্গে একাত্ম সম্বন্ধ লাভ করেছে। সমর্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এ সকল মহনীয়া কীর্ত্তির পুরাতন চিহ্ন আজো স্থানে স্থানে আমরা দেখতে পাই। এ জাতীয় নূতন নূতন সৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত ন্যূন নহে।

অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথায় সমাজসেবার প্রাগুক্ত আদর্শবাদের সুমহৎ তত্ত্বটি অতি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। জনৈক বিপ্রাধম এক তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল দান না ক'রে তাকে দূর দূর ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন, বলেন,—"আমার গৃহে অন্ন নাই, জল নাই, আসন নাই, তুই অন্যত্র গিয়ে যথারুচি জল পান কর।" তাঁর স্ত্রী সুশীলা। তিনি নামে যেমন, কর্ম্মেও তেমনি। তিনি পতির অপ্রিয় আচরণ লক্ষ্য ক'রে তাঁকে সময়োচিত ধর্ম্মবুদ্ধি দানের জন্য বলেন—"সে কি, আমাদের ধনসম্পত্তি তবে কি জন্য? গৃহাদিই বা কি জন্য? কেবল স্বকীয় উদরপূর্ত্তি? সে তো নিকৃষ্ট কুক্কুরের মধ্যেও বিদ্যমান।"

> কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থঞ্চ গৃহাদিকম্।
>
> স্বকীয়োদরপূর্ত্তিশ্চ কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে॥

সুশীলা তৃষ্ণার্ত্তকে জলপানে পরিতৃপ্ত করেন। এদিকে ব্রাহ্মণের গতি কি হয়? তিনি অন্তিমে যমলোকে গিয়ে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জল চেয়ে চেয়ে এক বিন্দু জলও পা'ন না। যমকিঙ্করগণ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার ক'রে বলে—"ন দত্তং বারি বিপ্রেভ্যঃ কথং বা প্রাপ্স্যতে জলম্?" তুমি তৃষ্ণার্ত্ত বিপ্রকে জল দাও নি, এখন জল কি ক'রে পেতে পার? কিন্তু সুশীলার পুণ্য বলে ব্রাহ্মণের নরকভোগ হয় না। জন্মান্তরে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রতে স্নান, দান, জপ, হোম, বিষ্ণুপূজার সহিত সভোজ্য জলপূর্ণ ঘটদান ক'রে তিনি ভগবানের প্রীতিভাজন হন। পিপীতকী দ্বাদশী ব্রতেও জলদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত। পিপীতক নামক এক ব্রাহ্মণ যমলোকে জল যাচঞা ক'রে না পেয়ে যমরাজের উপদেশানুসারে জন্মান্তরে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে যথানিয়মে পূজা পূর্ব্বক তাঁদের উদ্দেশ্যে জলকুম্ভাদি উৎসর্গ ক'রে মুক্তিলাভ করেন। পিপীতক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক

এই ব্রত বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বাদশী তিথিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে এ ব্রতের নাম হয়েছে পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত।

অক্ষয়তৃতীয়া ও পিপীতকী দ্বাদশী ব্রতে যেমন জল দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত, অন্নসংক্রান্তি ব্রতে তেমনি অন্নদানের সুফল উপদিষ্ট। সূর্য্যবংশের বিখ্যাত রাজা সেতু যেমন প্রতাপবান্, তেমনি শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল ও জপহোমপরায়ণ। এত সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যমলোকে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত। কারণ, জীবিতাবস্থায় তিনি বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করেন নি। মর্ত্ত্যলোকে এসে তাঁকে অন্নদানব্রত পালন করতে হয়, তবে তিনি লাভ করেন অভীষ্ট মুক্তি। এমনি ভাবে **দানসংক্রান্তি ব্রতে** জল, ছত্র, ব্যজন, আসন, রৌপ্য, স্বর্ণ, চন্দন, বস্ত্র, সুগন্ধ পুষ্পাদি দানের মাহাত্ম্য, **ফলসংক্রান্তি ব্রতে** ফলদানমাহাত্ম্য এবং **হরিতালিকা ব্রতে** ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীদিগকে বস্ত্র ও আভরণাদি দানের উৎকৃষ্ট ফলের কথা বর্ণিত। এ সকল দানমূলক ব্রতের উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ এই—মানুষের চরিত্রকে এমন সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা প্রতিবেশীর দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনে উপযুক্ত সাড়া দিতে পারে, মানবিকতার সোনার কাঠি স্পর্শে যেন তারা উন্নত জীবনের অধিকারী হয় এবং সহানুভূতি ও সমবেদনার ভূরি উদ্দীপ্তিতে যেন তাদের অন্তঃকরণ হার্দ্দিক কারুণ্যে ভরপুর হয়ে উঠে।

গোপূজা

সংহতি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, সমাজসেবা প্রভৃতির কথা আলোচিত হয়েছে। গোসম্পৎ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিও জাতীয় জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ব্রতোৎসবের ভিতর দিয়ে এ সকল প্রয়োজনের সম্পূর্ত্তির সন্ধান কি ভাবে করা হয়েছে, তা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখবো। গোপূজার কথাটা আগে বলি।

কৃষিপ্রধান ভারতে গোজাতির উপযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। পরাশর স্মৃতি বলেন—"গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ।"(৫।১০) বৃষ সম্বন্ধে বলা হয়—"উক্ষাণো বেধসা সৃষ্টাঃ শস্যস্যোৎপাদনায় চ।"(৫।৪৪) ব্রহ্মা বৃষকে বা বলীবর্দ্দকে সৃষ্টি করেছেন শস্য উৎপাদনের জন্য। কৃষি, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক প্রগতি তিনটি ক্ষেত্রেই গোজাতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কৃষির দ্বারা অন্নসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল হয়। এ ছাড়া পরিবহনাদি কার্য্যেও বলীবর্দ্দের উপযোগিতা যথেষ্ট। গোদুগ্ধ আমাদের পুষ্টি ও তুষ্টি দু-ই সাধন করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নানাবিধ উন্নততর যান-বাহন ও যন্ত্রাদির আবিষ্কার হওয়ায় কৃষি ও পরিবহন কার্য্যে বলীবর্দ্দের প্রয়োজনীয়তা আংশিক হ্রাসপ্রাপ্ত সত্য, কিন্তু, তথাপি সমাজকল্যাণের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এখনো সমভাবে বিদ্যমান। এ সম্বন্ধ কোন দিন চুকে যেতে পারে না। গোসম্পৎ মনুষ্যজাতির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নানাবিধ প্রয়োজনের

এক বিশেষ অপরিহার্য্য অঙ্গ। এমন নিরীহ, শান্তস্বভাব এবং পরোপকারী জীব জগতে আর দ্বিতীয় নেই। আকারে পশু হলেও স্বভাবে সে দেবতা। হিন্দুরা গো-জাতির অঙ্গে অঙ্গে তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করে। গাভীর শরীরে দেবত্বের এ কল্পনা হিন্দুর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সমষ্টিগত ফল নয়, পরন্তু এ তার কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধির অকুণ্ঠ পরিচায়ক। এ কৃতজ্ঞতা, ও শ্রদ্ধাবুদ্ধিই তাকে গোপূজায় প্রণোদিত করে। "গোপাষ্টমী" এই গোপূজার এক বিশিষ্ট তিথি। স্নানীয়, ভোজ্য, মাল্যাদি দ্বারা এই তিথিতে গোসম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই গোভক্তি ও গোসেবার শিক্ষা শিশুকাল থেকেই দেওয়া হয়ে আস্‌ছে। কুমারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত গোকল ব্রতের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি। গোজাতি যেখানে বসবাস করে সে স্থানটিও মন্দিরের ন্যায় পবিত্র। দেবমন্দিরকে যে ভাবে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, গোশালাকেও সে ভাবে আবর্জ্জনানির্মুক্ত ও স্বাস্থ্যোপযোগী ক'রে রাখা কর্ত্তব্য। আচারাৎ গোশালা পূজায় সে তত্ত্বটিই বিশেষভাবে প্রকট। মহারাষ্ট্রের পোলা উৎসব গোপূজারই অন্যতম নিদর্শন। গোজাতির প্রতি এই সেবা-ভক্তি একদা সুষ্ঠু গোপালনব্রতে হিন্দুদিগকে উৎসাহিত করে। আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিবাস, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক থেকে গাভী ও বলীবর্দ্দাদির কি ভাবে কতটুকু পরিচর্যা প্রয়োজন তা এই সেবাভক্তির অন্তঃপ্রেরণাই গৃহস্থকে শিখিয়ে দেয়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সেই গোপূজার বাহ্য অনুষ্ঠান এখনো আছে সত্য, কিন্তু, তা অনেকাংশে আন্তরিকতাহীন—এ কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। ভক্তি আছে, কিন্তু তা তামসিকতাদুষ্ট। ফলে প্রথানুরূপ গোসম্বর্দ্ধনা ও গোশালাপূজা হয়, কিন্তু গোজাতির দুঃখ ঘুচে না। অবহেলায়, অযত্নে, অর্দ্ধাহারে, অনুপযোগী আবাসে স্বাস্থ্যহীন ও কঙ্কালসার হয়ে জাতীয় সম্পদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ গোসমুদয় আজ মৃত্যুমুখী। এ অন্তিম অবস্থায়ও তাদের গোশালায় আর আশ্রয় হয় না, তাদিগকে পাঠানো হয় মৃত্যুবিভীষিকাময় কসাইখানায়।

কৃষি

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির প্রয়োজনেই স্বাস্থ্যবান, নীরোগ, দীর্ঘায়ুঃ ও কর্ম্মক্ষম বলীবর্দ্দাদির উপযুক্ত পরিচর্য্যাবিধি প্রবর্ত্তিত। কৃষিই এ দেশের প্রাণ। কৃষির প্রশস্তি সঙ্গীত গেয়ে পরাশরস্মৃতি বলেন—

সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় সর্ব্বযজ্ঞোপসিদ্ধয়ে।
নৃপস্য কোষবৃদ্ধ্যর্থং জায়তে কৃষিকৃন্নরঃ। ৫।১৫৭
কুর্য্যাৎ কৃষিং প্রযত্নেন সর্ব্বসত্ত্বোপজীবিনীম্।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং পুষ্টয়ে স্যাৎ কৃষীবলঃ ॥ ৫।১৫৮

অর্থাৎ, সকল প্রাণীর উপকারের জন্য, সকল যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য এবং রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য কৃষকের জন্ম। কৃষিই সকল প্রাণীর উপজীবিকা, কৃষিবলই পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের পুষ্টির কারণ, অতএব, প্রযত্ন সহকারে কৃষিকর্ম্ম করবে।

পুনশ্চ বলেন—

কৃষেরন্যত্র ন ধর্ম্মো ন লাভঃ কৃষিতোহন্যতঃ।
সুখং ন কৃষিতোহন্যত্র যদি ধর্ম্মেণ বর্ত্ততে ॥ ৫।১৮৫

অর্থাৎ, কৃষি থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নেই, কৃষি থেকে লাভজনক অন্য কোনও কর্ম্ম নেই, ধর্ম্মানুসারে কৃষিকর্ম্ম করলে কৃষি থেকে অধিক সুখ অন্য কোনও কার্য্যে নেই। বস্তুতঃ "কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।" কৃষি ধন্যা, কৃষি পূজ্যা, কৃষিই প্রাণিগণের জীবন বা জীবিকাস্বরূপা। জীবনের সঙ্গে কৃষির এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে ব'লে জীবনের আনন্দের সঙ্গেও তা একীভূত হয়ে আছে। হলকর্ষণ থেকে সুরু ক'রে ধান্যের কর্ত্তন ও সংগ্রহ পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যাপারের বিভিন্ন স্তরে কৃষিপ্রাণ ভারতীয় গৃহস্থদের অন্তরে যে প্রীতি ও আনন্দের উচ্ছ্বসিত সাড়া জাগে তা এক একটি বিশেষ উৎসব বা পার্ব্বণের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কৃষিপূজাই এ স্তরের উৎসব ও পার্ব্বণ সমুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষিমেধ বা কৃষিযজ্ঞ বা কৃষিপূজা ভারতবর্ষেরই এক অনবদ্যা রীতি। কৃষিমন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি পরাশর তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে সীতাযজ্ঞ ও খলযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন। সীতাযজ্ঞ অর্থে লাঙ্গলের পূজা, খলযজ্ঞ অর্থে শস্যের খামারের পূজা। কৃষির প্রতি এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেই সুনিশ্চিত ক'রে তোলে। অন্তরের সুগভীরে উপচিত এই শ্রদ্ধাই পরিণামে কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে কৃষকের সহস্র সহস্র রোমকূপপথে যেন স্বেদের তরল মূর্ত্তিতে উপ্‌চিয়ে পড়ে। দৈবী করুণা সে বিশ্বাস করে, কিন্তু পুরুষকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

অধুনা হলকর্ষণের সঙ্গে যে উৎসবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে, সেটি হলো অম্বুবাচী তিথি। উড়িষ্যায় রজোৎসব নামে পরিচিত। তবে পার্থক্য এই, অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হয় ৭ই আষাঢ়, কিন্তু রজোৎসবের প্রবৃত্তি ১লা আষাঢ়। এ তিথিটি কৃষি আরম্ভেরই সঙ্কেত দান করে। গৃহস্থের বিশ্বাস—এ সময়ে ধরিত্রী দেবী ঋতুমতী হন। ধরিত্রী বা পৃথিবীই তো কৃষির উৎপাদিকা। অম্বুবাচীর তিনটি দিন ব্রতিনীরা ফলমূল আহার ক'রে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এ তিথির উদ্‌যাপনা করেন। এ তিনটি দিন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া ও বীজ বপন করা নিষিদ্ধ। কেন না, ভূ-জননী যে রজস্বলা। রজস্বলা অবস্থায় নারীতে গর্ভাধান শাস্ত্রবহির্ভূত। অম্বুবাচী নিবৃত্তির পরই কৃষকেরা দলে দলে হাল-লাঙ্গল নিয়ে জমিতে নেমে পড়েন। দৈব

প্রতিকূল না হলে এ সময় থেকেই কৃষির উপযোগী প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। চষা খেতে জল জমে যায়। সরস ও উর্ব্বর ভূমিতে উপ্ত ধান্য চারাগুলি সবুজ সুষমা নিয়ে বিপুল তেজে পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে। ক'টি মাস পর আশ্বিনের প্রারম্ভে সেই চারা গাছগুলি প্রচুর গুচ্ছবদ্ধ হয়ে পরিণত অবস্থা লাভ করে। কৃষকগণ বুঝতে পারেন—এবার ফলনের সময় হয়েছে। ভূ-লক্ষ্মী গর্ভবতী হয়েছেন তার সূচনা নিয়ে ধান্যগুচ্ছের লম্বিত শীর্ষগুলি স্থূল হয়ে উঠে। ওর ভিতরেই আছে কৃষকের বাঞ্ছিত ধন, যার জন্য সে এত কৃচ্ছ্রসাধনা করে। পূর্ব্ব বঙ্গে দেখেছি, এই সময়ে হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে ধান্য পাদপকে "সাধ-ভক্ষণ" করানো হয়। অত্যল্প কাল পরেই কৃষকের মনঃসাধ পূর্ণ ক'রে ধান্য শীর্ষগুলি থোর প্রসব করে। আশ্বিনে দুর্গাপূজায় কদলী-কচু-হরিদ্রা-অশোকাদি নবপত্রিকার মধ্যে ধান্য পাদপও স্থান লাভ করে এবং তা কান্তারবাসিনী দেবীর প্রতীক রূপে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা পায়। নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতকণ্ঠে ধান্যস্তুতি ধ্বনিত হয়ে উঠে—

ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী।
স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥

অথবা

ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা॥

অম্বুবাচীর মধ্য দিয়ে যে কৃষিপূজার সূত্রপাত, শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের অন্যতম অঙ্গ নবপত্রিকার আরাধনায় সে কৃষিপূজাই পরিস্ফুট রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর পরই কোজাগরী পূর্ণিমায় শালিধান্যের মঞ্জরী হস্তে আবির্ভূতা হন সর্ব্বশস্যাত্মিকা দেবী লক্ষ্মী। সমগ্র ধরণী তখন হিরণ্ময় শোভায় ভরে উঠে। কাঞ্চনসন্নিভা দেবী কৃষিমেধের বিপুল সাফল্যের আনন্দবার্ত্তা বহন ক'রে আপন মূর্ত্তিতেই যেন ভূতলে অবতীর্ণা, তা সচেতন ভাবে অনুভব করা যায়।

অতঃপর কৃষি-উৎসবের আছে আর দু'টি স্তর—অগ্রহায়ণে নবান্ন এবং পৌষসংক্রান্তিতে পিঠে-পার্ব্বণ। প্রথম ধান্য ঘরে উঠ্‌লে তা দিয়ে অগ্রে দেবতার পূজা সমাধা ক'রে তবে গৃহস্থ নিজে ভোগ করেন। যাঁর দেওয়া ধন তাঁকে অগ্রভাগ প্রদানের হিন্দুআচারসম্মত এই যে আন্তরিক প্রেরণা ও অভিলাষ তা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে নবান্ন উৎসবের। মানুষ কর্ম্মই করতে পারে, কিন্তু ফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর। কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষই করতে পারে, কিন্তু গাছের ডগায় ঐ যে গোছা গোছা পাকা ফল ঝুলছে, তা হলো পরম দাতার অপার্থিব করুণার অফুরন্ত দান। সুতরাং, তাঁর দেওয়া ধন তাঁকে অর্পণপূর্ব্বক ভোগ না করলে যে চুরি করা হয়।

অগ্রহায়ণ এবং পৌষ—এ দু'টি মাসে কৃষকের বিন্দুমাত্র অবসর থাকে না। ধানকাটা, ধানঝাড়া, ধান গোলাজাত করা—এ সব কাজে তাকে অতিমাত্র ব্যস্ত থাকতে হয়। অবশেষে আসে পূর্ণ অবসর। স্বভাবতঃই এ সময়ে কঠোর শ্রমলব্ধ ভোগ্যবস্তুকে অন্তরের সবটুকু আস্পৃহা ও তৃপ্তির মাধুর্য্য দিয়ে বিবিধ স্বাদু উপচারসংযোগে আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। এ আস্পৃহা পরম চরিতার্থতা লাভ করে পৌষ-পার্ব্বণের পিঠে-পায়েসের ভূরি আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এ উৎসব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অগ্রভাগ দেওয়া হয় দেবতাকে। অতঃপর একটি পিঠে দেওয়া হয় গোমুখে, অন্যটি খেচর প্রাণীদের জন্য গৃহের চালে এবং তৃতীয়টি জলচর প্রাণীদের জন্য পুষ্করিণীতে।

নিজে ভোগ করার পূর্ব্বে ভোগ্যদাতা দেবতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাণিজগতের সেবার কথাই ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ স্মরণ করেন।

কৃষি-উৎসবের আর একটি বিশেষ ধারা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রথার মধ্যে অন্তর্নিহিত। আমরা জানি—বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে দুটি বৃক্ষের বিবাহ দান অতি পুণ্যজনক। কোন কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকে এতদুপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে দেখেছি। শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যাপূর্ব্বক অধুনা দেশনেতৃবৃন্দ বলেন—এক একটি বৃক্ষ পাঁচ পাঁচটি সন্তানের সমান। সুতরাং, একটি বৃক্ষ রোপণের ভিতর দিয়ে পাঁচটি সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করা যায়। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই—শাস্ত্রকারগণ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ব্যাপারের কেন এত প্রশংসা করেছেন, সে বিষয়ে পুণ্যকামীদের অনেকেই যথেষ্ট সচেতন নন। নিছক পুণ্য অর্জ্জনের মানসেই তাঁরা একার্য্যে ব্রতী হন। সুতরাং, এ কথা বলা চলে যে, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি অধুনা বিক্ষিপ্ত এবং গতানুগতিক অনুষ্ঠানে পরিণত। এর আসল এবং ব্যাপক রূপটি বড় আর দেখা যায় না।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ন্যায় ভারতীয় প্রজ্ঞাবান্ ঋষিদেরও দূরদৃষ্টি ছিল। তাঁরাও জানতেন—ভূপৃষ্ঠস্থ বনরাজি আকাশে ভাসমান মেঘরাশিকে বর্ষণের জন্য নিম্নে আকর্ষণ করে। যেখানে ঘন বন বেশী, সেখানে বর্ষণও বেশী। সুতরাং, কৃষির উপযোগী বর্ষণের স্বার্থেই দেশের বনসম্পৎ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ছায়া, ফল, ওষধি কাষ্ঠাদির জন্যও নানা শ্রেণীর বৃক্ষের প্রাচুর্য্য চাই। এক সর্ব্বাত্মক উদ্দেশ্যের পরিপোষক রূপেই বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা উৎসব পুণ্যজনক। আজকাল সরকারী ভাবে বন-মহোৎসব উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

কৃষির প্রয়োজন কেন? নিশ্চয়ই বলা হবে—প্রধানতঃ অন্নের জন্য। অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—জননী অন্নপূর্ণা। বসন্ত কালে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহেই এ দেবীর পূজোৎসব হতে দেখা যায়।

বাণিজ্য

কৃষির পরে স্বাভাবিক ভাবেই বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উঠে। এ ক্ষেত্রে দু'টি দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্ব আমাদের চোখে পড়ে। এক গন্ধেশ্বরী, দ্বিতীয় লক্ষ্মী। বাণিজ্যবৃদ্ধির কামনায় গন্ধবণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গন্ধেশ্বরীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কিন্তু ধনের উৎপাদন, ধনবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দেবী লক্ষ্মী হিন্দু মাত্রেরই সাধারণ উপাস্যা। ধনদানে দেবী লক্ষ্মীর কারুণ্য ও ঔদার্য্যের একাধিক দৃষ্টান্ত সধবাব্রতের আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর ভূমিকা কি, এক্ষণে সে বিষয়ে দু'টি একটি কথা উঠছে।

লক্ষ্মী কৃষকের নিকট যেমন ধান্যময়ী কৃষিদেবতা, বণিকের কাছে তেমনি বাণিজ্যময়ী বাণিজ্যের দেবতা। লক্ষ্মী সম্বন্ধে পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি 'বাণিজ্যরূপা বণিজাম্।' লোকপ্রবাদও আছে—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।' সত্য বল্‌তে কি, বাণিজ্যের মধ্যেই লক্ষ্মীপূজার ব্যাবহারিক স্বরূপ সুপরিস্ফুট। প্রাচীন কালে বাংলার শেঠ ও সওদাগরেরা লক্ষ্মীপূজায় দেবীর মহাশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে অতঃপর বাণিজ্যতরণী সাজিয়ে উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশদেশন্তরে ছুটে যেতেন এবং ব্যবসায়ের দ্বারা প্রচুর ধন ও বিনিময় দ্রব্য আহরণ ক'রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন। বাণিজ্যযাত্রার সেই তাৎপর্য্যপূর্ণ সঙ্কেত অদ্যাবধি আমরা লক্ষ্য করি কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্ব বঙ্গীয় রীতি বিশেষের ভিতরে। কদলীবল্কলনির্ম্মিত একখানি ছোট্ট নৌকা শস্য-রত্নাদি দ্বারা সাজিয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমার পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। পর দিন সেই নৌকাখানিকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিয়ে সন্নিহিত জলাশয়ে ঘটা ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

নববর্ষে হালখাতা। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে প্রীতি, সখ্য, বিশ্বাস ও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনপূর্ব্বক ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্যই এ উৎসব হয়ে থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যবসায়ী খাতাপূজার কালে গণেশাদি দেবতার আশীর্ব্বাদও কামনা করেন।

শিল্পকলা

বাণিজ্যের পর শিল্পকলা সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা প্রবেশ করলাম। শিক্ষা, সংহতি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্যাদির ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তেমনি ধর্ম্মই এদেশের প্রেরণার মূল উৎস। সত্য, শিব ও সুন্দরের সার্থক উপাসক হিন্দু তার সাধনলব্ধ দিব্য চেতনার অত্যুন্নত স্তরে উঠে যে বিশুদ্ধ রুচিবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধের অধিকারী হয়েছিল, ভারতের প্রবর্ত্তিত শিল্পকলায় তারই সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনা আমরা দেখ্‌তে পাই। দেবমন্দির নির্ম্মাণ, প্রতিমা

গঠন, পূজামণ্ডপ সজ্জা, যজ্ঞবেদী রচনা, ব্রতাদিতে আলিম্পনা অঙ্কন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। অবশ্য মনুষ্য-সমাজের সাধারণ প্রায়োজন ও প্রসাধনবৃত্তি চরিতার্থ করতেও ভারতীয় শিল্পসাধনার অবদান কম নয়। কিন্তু, তৎসমুদয়ও উন্নত ও মার্জ্জিত রুচির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই শুচিতা ও সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছেন যিনি, তিনি আমাদের অতি সুপরিচিত দেবতা **বিশ্বকর্ম্মা**। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তি তিথিতে ছোট বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আড়ম্বরের সঙ্গেই তাঁর পূজারাধনা হয়। অধুনা শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক প্রগতির ধারা ষোল আনাই আমরা গ্রহণ করছি, তা ঠিক, কিন্তু তাতে শিল্পদেবতা বিশ্বকর্ম্মার প্রাপ্য পূজা হ্রাস পায় নি, বরং যত বেশী নূতন নূতন শিল্পের প্রসার হচ্ছে, তাঁর পূজাও তত অধিক সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা হ'তেই ভারতের যাবতীয় শিল্পকলার উৎপত্তি—এ কথা ঘোষণা করেন হিন্দুর পুরাণ-সাহিত্যগুলি। প্রাসাদ, উদ্যান, ভবন ও বিমানাদি নির্ম্মাণ থেকে আরম্ভ ক'রে পটশিল্প, দারুশিল্প, স্বর্ণশিল্প, কাংসশিল্প, বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, পুষ্পশিল্প এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্প সকলই বিশ্বকর্ম্মার শিল্পাবদানের অনবদ্য সাক্ষ্য। চিত্রকর, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কাংসকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, মালাকার, কুবিন্দক প্রভৃতি যে সকল শিল্পী সম্প্রদায়কে আজো আমরা নানা চারু ও কারুশিল্পে নিরত দেখি, তারা সকলেই বিশ্বকর্ম্মার সন্তান। তিনি শুধু নিজে শিল্পী নন, তিনি শিল্পীসম্প্রদায়ের জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা।

বেদোক্ত ত্বষ্টাকেও দেবশিল্পী বলা হয়।

অখণ্ড জাতীয়তা

দেবপূজা ও ব্রতোৎসবের ভিতর জাতীয় উন্নতি ও রাষ্ট্রচিন্তার কয়েকটি প্রধান দিক আলোচিত হয়েছে। বাঙ্গালীর প্রসিদ্ধ **দুর্গোৎসবে** একই প্রতিমার ভিতর ঐ সকল দিকগুলিই আমরা সমন্বিত দেখতে পাই। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা কেবল অসুরনাশিনীই নন, তিনি জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, ধনশক্তি ও গণশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও গণেশ এই নিয়ে দেবীর ধরায় আগমন। জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সাধনা সম্বন্ধে মানুষের যে পরিণত ধারণা, সে ধারণা চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে অবতরণ ক'রে যেন স্থূল রূপ পরিগ্রহ করেছে ঐ দুর্গাপ্রতিমায়। রাষ্ট্রীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই যেন জননী দেবীসূক্তে স্বমুখে ঘোষণা করেন—"অহং রাষ্ট্রী।"—আমি বিশ্বরাষ্ট্রের অধীশ্বরী। রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, মিত্র, সোম, ত্বষ্টা, পূষা, বিশ্বদেবগণ বস্তুতঃ তাঁর শক্তিতেই শক্তিমান্।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এর তাৎপর্য্য আরো সুস্পষ্ট, তিনি সেখানে "নিঃশেষদেবগণশক্তি-সমূহমূর্ত্তে" ব'লে স্তুতা—সর্ব্বদেবগণের মিলিত শক্তির সমবায়েই তাঁর মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ ; স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্রকে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাদানকারিণী। উপচার সংগ্রহ থেকে আরম্ভ ক'রে দেবীপূজার প্রতিটি ক্রমে সংহতির সাধনা ও জাতীয়তার চেতনার চিহ্ন পাওয়া যায়। আনন্দ, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের সঙ্গে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সংহতি, স্বাধীনতা, শত্রুজয়, দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্পে দুর্গাপূজা সত্য সত্যই অখণ্ড জতীয়তা ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয়তার পূজায় সার্থক পরিণতি লাভ করে।

ঠিক জাতীয়তার ভাবটি ষোল আনা প্রকাশিত না হ'লেও পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিত ত্রিনাথের পূজায় সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এক দেহে ত্রিনাথ। উপাস্য নিয়ে উপাসকগণের মধ্যে মাঝে মাঝে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী। এ দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতে পারলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়, রাষ্ট্রও হয় শক্তিশালী। সুতরাং, ত্রিনাথের পূজা এদিক থেকে সার্থকতাপূর্ণ। পূজার বিধানও অতি অনাড়ম্বর—এক পয়সার পান-সুপারী, এক পয়সার তৈল এবং এক পয়সার গঞ্জিকা হ'লেই ত্রিনাথ খুসী। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের পূজা ক'রে তাঁর হারাণো গোধন ফিরে পান, কিন্তু এ পূজায় অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ফলে সেই ব্রাহ্মণেরই আরাধ্য গুরুদেব স্ত্রীপুত্রকে যমালয়ে হারাণ। "গো" অর্থে বেদও হয়। গো-উদ্ধার অর্থে ব্রাহ্মণের লুপ্ত বেদজ্ঞানের উদ্ধার, গায়ত্রী উদ্ধার, এরূপ বলা অসঙ্গত নয়। কিন্তু, ত্রিনাথেয় ভক্তেরা এত বড় অর্থ করেন না। কিন্তু করলে মন্দ কি ? ত্রিনাথের অধ্যাত্ম মহিমাই তাতে যথার্থ রূপে প্রকাশ পায়, পূজার উপযোগিতাও বাড়ে। নতুবা, একটা মাত্র হারাণো গরুর সন্ধানে ব্রাহ্মণের ত্রি-দেবতার কাছে ধরনা দেবার বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে কি ?

প্রসঙ্গতঃ বলি—অধুনা ত্রিনাথের পূজা দুঃখজনক ভাবে বিকৃত। এক পয়সার গঞ্জিকায় ত্রিদেবতা এখন আর সন্তুষ্ট হন না। ভক্তদের গঞ্জিকাপ্রীতির কুণ্ডলীকৃত গাঢ় ধূমে আসল ত্রিনাথ আচ্ছন্ন—'পরিত্রাহি' আর্ত্তনাদপরায়ণ। পূজাটি বিশুদ্ধ ভাবে আচরণ করলে কিন্তু ভালই হয়।

অখণ্ড বিশ্বসংহতি

দেবপূজার ভিতর জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সাধনার যে সঙ্কেত, তা দুর্গোৎসবের ভিতর লক্ষ্য করেছি। কিন্তু, একটা কথা মনে রাখা উচিত—এ জাতীয়তাবাদ পশ্চাত্যের আধুনিক ভোগবাদদুষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদ নয়, যা পৃথিবীর অন্য দেশ ও রাষ্ট্রকে শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনা ক'রে শুধু নিজে বড় হতে চায়, কিন্তু মুখে কেবল বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসংহতির ছেঁদো বুলি আওড়ায়।

ভারতের ধর্ম্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেই পরিপুষ্টি লাভ করে। জাতীয়তাবোধ ও বিশ্ববোধের মধ্যে হিন্দু কোনও মূলগত পার্থক্য দেখে না। জাতীয় সংহতির সাধনা বিশ্বসংহতি সাধনারই এক অপরিহার্য ও অবিরোধী সোপান। হিন্দু নিজের জাতির সেবা যেমন করতে চায়, তেমনি সমগ্র বিশ্বমানবের সেবা, রক্ষণ ও পোষণেও সে সমান আগ্রহী। এ শিক্ষাও সে পেয়েছে দেবপূজা থেকেই। হিন্দু কেবল রাষ্ট্রশক্তিস্বরূপিণী দেবী দুর্গারই উপাসক নয়, সে জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রীর ভক্ত ও পূজারী। দেবী সমগ্র জগৎকে আপন উদার অঙ্কে ধৃতিশক্তির অভিন্ন মহিমায় ধ'রে রেখেছেন—সকল জীবের পালন, পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের গুরু ভার নিজে গ্রহণ করেছেন। তিনি জগদ্ধাত্রী, তিনি বিশ্বাত্মিকা। কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে বাংলার বহু স্থানে—বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই এঁর পূজা অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। জগদ্ধাত্রী এবং দুর্গা আসলে একই। একই দেবীর দুই রূপ। এক রূপে তিনি দেবগণের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দেন, জাতীয়তাবোধে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অন্যরূপে তিনি সমগ্র বিশ্বের পালন, পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনকর্ত্রী এবং আমাদিগকেও বিশ্ববোধ, বিশ্বসংহতি ও বিশ্বচৈতন্যে প্রেরণাদায়িনী। উভয়েই বিশ্বের অশুভনাশিনী। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনাকালে বিপত্তারিণী বা নিস্তারিণী রূপে যাঁর দর্শন লাভ আমরা করবো, তিনি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রীর সহিত অভিন্ন। জাগতিক সমৃদ্ধি লাভের প্রার্থনাপূরণে যিনি বরদা মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজমানা, তিনিই আবার আমাদের দুখঃনাশিনী। দুঃখ নাশ না হ'লে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের পথ প্রস্তুত হয় না। শুধু দুর্গতিহারিণী দুর্গার কাছেই নয়, বহু দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দু তার নানা স্তরের দুঃখ নাশের জন্য শীতলা, মনসা, ঘণ্টাকর্ণ, পঞ্চানন্দ, শনি, রবি, যম প্রভৃতি নানা দেবতার করুণা ভিক্ষাও করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রতোৎসবে দুঃখনিবৃত্তির উপায় সন্ধান

——ঃ০ঃ——

কমলকলির প্রসঙ্গ আমরা অনেক প্রকারে বলেছি, তার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাসও আলোচনা করেছি, আহরিত ফুল্ল কমলদলে মনের আহ্লাদে ছোট-বড় কত মালা গাঁথাও হয়ে গেছে, কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার ক'রে বলা হয় নি, ওর যে কত বিপদ তা অকথিত র'য়ে গেছে। কমলকলিটি প্রস্ফুটিত হয় প্রকৃতির শুভ সাহচর্য্যেই, কিন্তু প্রকৃতি যদি বিরূপা হন তবে অঙ্কুরেই ওর বিনাশের সম্ভাবনা। ধরুন—পুকুরের জলে কমলদল ফোটে, কিন্তু হঠাৎ যদি প্রবল বন্যা হয়ে জলাশয়টি অতি মাত্রায় ডুবে যায়, তবে কুঁড়িগুলি পচে যাবে। কমলকলি প্রস্ফুটনে সূর্য্যের কিরণপ্রসাদ অত্যাবশ্যক। কিন্তু অতিমাত্র খরায় যদি পুকুরের জল শুখিয়ে যায়, তবে সূর্য্যতাপই হবে ওর পরম শত্রু। রসজ্ঞ মধুকরের কোমল গুঞ্জন সুরভিত কমলের মধুরিমার সহিত কতই না যোগ্য ও মনোরম। কিন্তু, বহু বে-রসিক কীটও আছে, যারা ওর পাপড়িগুলিকে কেটে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিতে পারে। এ সব বিঘ্ন ছাড়া ওর নিজস্ব জীবনীশক্তির ক্ষীণতাও থাক্‌তে পারে। এতগুলি বিপদ থেকে মুক্ত হ'লে তবেই কমলটি প্রস্ফুটিত হ'তে সুযোগ পায়, নতুবা নয়।

উপর্য্যুক্ত দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দুঃখ ও বিপদের ক্ষেত্রগুলির কথাও ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ চায় সুখ, মানুষ চায় নিজের অভ্যুদয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাদির এত যে ব্যবস্থা তা সবই তার সুখের জন্য; পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনে সে যে এত চেষ্টিত, তাও তার সুখের নিমিত্তই;—আত্মসুখ ও আত্মকল্যাণের জন্য মানুষ সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। এ জগতে দুঃখ চায় না কেউ। বরং চায় দুঃখনিবৃত্তি। মানুষের জীবনদর্শনের সর্ব্বাপেক্ষা এক বড় আবেদন এই দুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুঃখ মানুষ চায় না, তবু সে দুঃখভাগী হয়। সাধারণতঃ জীবের এ দুঃখ ত্রিবিধ। এ'কে ত্রিতাপও বলা হয়। শরীর ও মনকে আশ্রয় ক'রে যে দুঃখের উদ্ভব, তা হলো আধ্যাত্মিক দুঃখ, দৈব থেকে যে বিঘ্ন ও বিপত্তি আসে, তা আধিদৈবিক দুঃখ এবং প্রতিকূল জীবের নিকট হ'তে যে প্রতিকূল আচরণ আমরা পাই তা হলো আধিভৌতিক দুঃখ। কমলকলির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে এ ত্রিবিধ দুঃখ ও বিপদের সঙ্কেতই আমরা দিয়েছিলাম। মানুষের ক্ষেত্রে এ দুঃখবাদের বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এবং

এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্ধান সে কি ভাবে করেছে তাও বিচার্য্য।

পূর্ব্বেই বলেছি—দুঃখ ত্রিবিধ এবং জীবমাত্রই চায় দুঃখনিবৃত্তি। সাংখ্যকার কপিল এই দুঃখনিবৃত্তির তত্ত্ব দিয়েই তাঁর প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। "অথ ত্রিবিধদুঃখাদত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এইটিই হলো সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্র। তবে এখানে আমরা দর্শনশাস্ত্রের বিতর্কিত আলোচনা-বৈঠকে বসি নি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবন। প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, জন্ম-মৃত্যু, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের যে অবিশ্রান্ত সংঘাত, তার মধ্যে স্থির ও নির্ব্বিকার থাকার কৌশলটি শিখে নিয়ে সত্যের আলোকোজ্জ্বল মার্গে নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে বিচরণ করাই হলো প্রকৃত জীবন এবং জীবনের সাধনা। সেই জন্যই সুখের ন্যায় দুঃখকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। দুঃখ আছে ব'লেই তো সুখের সন্ধান আমরা করি। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেই জীবনের মূল্যবোধ আমরা যথাযথ উপলব্ধি করার সুযোগ পাই। সুতরাং, দুঃখের আলোচনাকে বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় শ্রুতি-স্মৃতি চিন্তা করেছেন, দর্শনশাস্ত্রে এর আলোচনা হয়েছে, ব্রত-পার্ব্বণের ভিতর দিয়েও দুঃখনিবৃত্তির উপায় সন্ধান করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে সুখ-সমৃদ্ধির এত রকমফের আলোচনার পর আমরাও এক্ষণে দুঃখের চর্চ্চায় প্রবেশ করছি। দুঃখে ক্রন্দন দুঃখকে লাঘব করবে, এ সান্ত্বনা আছে।

দুঃখের ত্রিবিধ রূপের কথা আমরা জানি। এ ত্রিবিধ দুঃখের কোন না কোনটির সঙ্গে প্রায়শঃই আমাদের পরিচয় ঘটে। দুঃখের অসহনীয় যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়ি। ভরসা কোথা? ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু বিশ্বাস করে দুঃখ যেমন আছে, তেমনি তা অপনোদনের জন্য দুঃখহারীও আছেন। এ বিশ্বাসই তাকে দুঃখ ও ঘোর বিপত্তিকালেও ঈশ্বরারাধনামূলক ব্রতাচরণে নিয়োজিত করে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিবিধ দুঃখ নাশের জন্য সে যেমন দার্শনিক বিচার বা যোগ-ধ্যান-তপস্যায় নিরত হয়, তেমনি নানা সময়ে নানা প্রকার ব্রতাচরণেও মনোনিবেশ করে। ব্রতাচরণের মাধ্যমে দুঃখনাশের উপায় সন্ধান কি ভাবে করা হয়েছে, এ অধ্যায়ে সে বিষয়টিই আলোচিত হবে।

আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তি

আধ্যাত্মিক দুঃখ কা'কে বলে? আমরা জানি, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। কেবল বৈদ্য এবং ওষধি সহযোগে এ দুঃখের সম্যক্ নিরাকৃতি সর্ব্বদা হয় না। মানুষের চিত্তে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভরসা

জাগিয়ে তোলা আবশ্যক হয়। বিশেষতঃ কলেরা, বসন্ত, রাজযক্ষ্মা, দুরারোগ্য জ্বর, নানাবিধ জটিল যৌনব্যাধি, কুষ্ঠাদি কঠিন চর্ম্মরোগে মনুষ্য-বৈদ্যের সকল প্রকার কৃতিত্ব যখন একান্ত নিষ্ফল, তখন ভববৈদ্যকে একবার প্রাণ খুলে ডেকে দেখলে ক্ষতি কি? তাঁর করুণার অমৃতপ্রলেপে ব্যাধিশান্তি অসম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দৈব বিশ্বাসও পরমৌষধির কার্য্য করে, এ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ে আত্মিক বল প্রত্যক্ষ ভাবেই উপযোগী। অনেক কঠিন ব্যাধিরই গোড়া হচ্ছে অসুস্থ মন—একথা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। আত্মার দিকে প্রত্যাবৃত্ত দৃষ্টি মনকে সুস্থ, শুদ্ধ, সুদৃঢ় ও সুন্দর করে।

বসন্ত বা মসূরিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন মা শীতলা. আর কলেরা বা ওলাউঠা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ওলাই চণ্ডী। কলেরা এবং বসন্ত ব্যাপকরূপে দেখা দিলে এই দুই দেবতার পূজার ধূম পড়ে যায়। কোন কোন সময় কালীপূজা এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—শীতলা ও ওলাই চণ্ডী-পূজার স্থান গ্রহণ করে। এতে আতঙ্কিত পল্লীবাসীদের মনে প্রভূত সাহস ও সর্তকতার ভাব সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ব্যাপক মহামারীর প্রাণঘাতী তাণ্ডবকালে আত্মিক ভরসা আহরণে এ সকল ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের উপযোগিতা ও তাৎপর্য্য অনস্বীকার্য্য।

প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি, সাধারণ ভাবে মসূরিকাদি রোগের তাপশান্তির উদ্দেশ্যে শীতলার পূজা অনুষ্ঠিত হ'লেও পৌরাণিক শীতলা সপ্তমী ব্রতের তাৎপর্য্য কিন্তু স্বতন্ত্র। অবৈধব্যই এই ব্রতের মূল লভ্য। কোনও ব্রাহ্মণী এ ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে তাঁর সর্পদষ্ট পতির প্রাণলাভ করেন। মসূরিকাদি রোগের কোন কথাই এখানে নেই।

খোস-পাঁচড়ার দেবতা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু। এঁর পূজার প্রধান উপকরণ ঘেঁটুফুল, হলুদছোবানো বস্ত্রখণ্ড, পোড়া হাঁড়ি এবং একটা লম্বিত লগুড় বা লাঠি। কাঁচা হলুদ এবং ঘেঁটুপাতার রস প্রত্যক্ষ ভাবেই রক্তপরিষ্কারক, সুতরাং চর্ম্মরোগের ঔষধবিশেষ। পোড়া হাঁড়িটা বোধ হয় অশুভ ব্যাধির প্রতীক। প্রচণ্ড এক লগুড়াঘাতের দাওয়াই দিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সংক্ষেপে এ-ই হলো ঘেঁটুপূজা। কিছু মন্ত্র-তন্ত্রও আছে, যেমন—

ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥

ইত্যাদি।

হাঁড়ি ভাঙ্গার শুভ কার্য্যটি সাধারণতঃ সমাধা করে ক্রীড়ামোদী বালকেরাই। খুব মজা লাগে ওদের।

রাজযক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগের নিরাকরণার্থ **চম্পক চতুর্দ্দশী** ব্রত এবং দীর্ঘ-মেয়াদী জ্বররোগের প্রতিকারের জন্য জ্বর দেবতার পূজার বিধান। জ্বর দেবতার রূপ বিচিত্র। তিনি "ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।" অর্থাৎ, তাঁর তিনটি চরণ, তিনটি শিরঃ, ছ'টি বাহু এবং ন'টি চক্ষুঃ। জ্বর নামক ব্যাধি-বিশেষের বায়ু, পিত্ত বা কফাশ্রিত নানাবিধ লক্ষণ ও বিকারাদির সহিত জ্বরদেবতার এই বিচিত্র রূপকল্পনার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তা বিশেষজ্ঞগণ বল্‌তে পারেন। জ্বরের প্রতিকারের জন্য "জ্বরাজ্বরীর ব্রত" পালন করতেও দেখেছি।

চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে কয়েকটি অশোক পুষ্প ভক্ষণ ক'রে মেয়েরা **অশোক ষষ্ঠী** ব্রত উদ্‌যাপন করেন। অশোক বৃক্ষের ত্বক্ স্ত্রীব্যাধির এক মহৌষধী। **অশোকাষ্টমী** নামে আর এক ব্রতের কথাও প্রসিদ্ধ লিঙ্গপুরাণে বর্ণিত। তবে তার উদ্দেশ্য মূলতঃ মানসিক শান্তি। শোকের অভাবই অশোক। এই স্বনামধন্য বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসে তপঃসাধনা ক'রেই গিরিকুমারী গৌরী হৃতশোকা ও সিদ্ধমনোরথা। রাবণগৃহে বন্দিনী সাধ্বী সীতারও শান্তি ও সান্ত্বনার নিভৃত আশ্রয় ছিল অশোককুঞ্জ। সংসারদুঃখ-ভারাক্রান্ত মানুষের চিত্ত চায় বিশ্রাম। ভগবচ্চরণের সুশীতল ছায়াই চিত্তবিশ্রামের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ঐটিই তাপশান্তির অনাবিল অশোক কানন। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে **আরোগ্যসপ্তমী ব্রত**। এই ব্রতে সূর্যপূজা বিহিত। সূর্যরশ্মির মধ্যে রোগপ্রতিষেধক শক্তি নিহিত, এ বিষয়ে আজ আরো কারো দ্বিমত নেই। **মাকরী সপ্তমী** ব্রত ও **বিধান সপ্তমী** ব্রতেও সূর্য্যই উপাস্য।

আধিভৌতিক দুঃখের নিবৃত্তি

মানুষ চায় না কোন প্রাণী তাকে হিংসা করুক। সমগ্র বিশ্বকেই সে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখতে চায় এবং তর্পণবিধির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, সে সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর কল্যাণের জন্যও কতখানি আগ্রহী। কিন্তু, নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, তবু মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে দুঃখ পায়, অধিক কি মানুষও পর্য্যন্ত মানুষকে হিংসা করে। চৌর, দস্যু থেকে আরম্ভ ক'রে সর্পব্যাঘ্রাদি পর্য্যন্ত অনেক প্রাণীর কাছেই তার ভয় আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় সর্পের।

সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মনসা। **নাগপঞ্চমী** তিথিতে অষ্টনাগমূর্ত্তিতে তাঁর পূজা প্রায় ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পল্লীর বারোয়ারী স্থান-সমূহে নানা গ্রাম্য দেবতার মধ্যে মনসার মূর্ত্তিও আমরা প্রায়শঃ দেখে থাকি এবং সেখানেও তাঁর পূজা হয়। মনসার ব্রতকথায় আছে, কোনও নারী

অষ্টনাগকে দুগ্ধ-কদলী দ্বারা সেবা ক'রে মা মনসার করুণা লাভ করে। তার সর্পভয়ও নিবারিত হয় এবং সে ঐশ্বর্য্য ও সমাদরও লাভ করে।

সর্পের দেবতা যেমন মনসা, ব্যাঘ্রের দেবতা তেমনি দক্ষিণ রায়। বনাকীর্ণ অঞ্চলে হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আছেন বনদেবী বা বনদুর্গা, পথযাত্রায় রক্ষক ও বান্ধব অটেশ্বর। গ্রাম্য বারোয়ারী স্থানগুলিতে এ সকল দেবতার মূর্ত্তি আজো দেখা যায়। বনদেবী বা বনদুর্গার স্বতন্ত্র স্থানও বহু পল্লীতে দেখেছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৈদিক দেবতা পূষা ছিলেন পালিত পশুগণের রক্ষক, তিনিই ছিলেন পথের দস্যু ও বনের হিংস্র জন্তু থেকে ত্রাণকারী এবং এতদুপায়ে তিনি পথিকের যাত্রাপথ নির্ব্বিঘ্ন ও স্বচ্ছন্দ ক'রে দিতেন। বৈদিক দেবতা পূষার এ সকল ভাব বনদেবী, অটেশ্বর, দক্ষিণ রায় আদি গ্রাম্য দেবতার মধ্যে সমন্বিত দেখা যায় কি ?

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হ'লেও নানা প্রকার রোগবীজানু এবং বিষাক্ত পোকামাকড়ও মানুষের কম ক্ষতি সাধন করে না। সারা কার্ত্তিক মাস ব্যাপী আকাশ প্রদীপ দান, কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে ভুল উড়ানো, দোলপূর্ণিমায় বুড়ীর ঘর পোড়ানো এবং দীপান্বিতা কালীপূজায় দীপাবলী দান ও বাজি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে বহু পোকামাকড় মরায় এ শ্রেণীর আধিভৌতিক সঙ্কটের সম্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ সহজতর হয়—বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ মত প্রকাশ ক'রে থাকেন।

আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি

পোড়া ভাগ্যের দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে এমন এক স্থানে আমরা এসে পৌঁছেছি, যেখানে বৈদ্য. ওষধি, সতর্কতা ও নিরাপত্তার শত ব্যবস্থা কোনটাই কার্যকরী নয়। এ দুঃখ আধিদৈবিক—দৈবই এর মূল উৎস। মানুষের বুদ্ধি এবং শক্তির সীমিত পরিধির ভিতর এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। আকস্মিক বন্যাপ্রবাহের মত বা বিনামেঘে বজ্রপাতের মত অজ্ঞাতে এবং অতর্কিতে এ দুঃখ আমাদের মাথায় এসে পড়ে। আধিদৈবিক দুঃখের মূল সাধারণতঃ চারটি—অগ্নিভয়, গ্রহভয়, ভূত-প্রেতের ভয়, যমভয়। অগ্নিভয় নিরাকরণার্থ ব্রহ্মাপূজা এবং গ্রহভয় খণ্ডনার্থ নবগ্রহাদির পূজা ও কবচাদি ধারণ বিহিত আছে।

কিন্তু, গ্রহের মধ্যে শনি ঠাকুরের প্রকৃতিই অত্যন্ত উগ্র। তাঁর রোষদৃষ্টিতে পড়লে বিত্তনাশ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, অনিষ্টোৎপত্তি, দেহপীড়া, দৌর্ম্মনস্য, রাজরোষ, বন্ধুবিচ্ছেদ, চরিত্রহানি কোন্ অনর্থ না সম্ভব ? অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ষণ্ডবায়ু এ সকল প্রাকৃতিক উৎপাতও তোয়াধিপ শনির অশুভ

দৃষ্টিরই ফল। রাজা শ্রীবৎস নিরপরাধ ও ন্যায়বিচারক ছিলেন, কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও তাঁকে শনি ঠাকুরের কোপে পতিত হয়ে ভোগকাল পর্য্যন্ত রাজ্যহারা, ধনহারা ও পত্নীহারা হ'তে হয়েছিল। কুপিত অবস্থায় শনি মানুষের সর্ব্বনাশ করতে পারেন, আবার প্রসন্ন হ'লে পরম হিতকারী হন। শনির পাঁচালীর গল্পে আছে, সুমঙ্গল নামধেয় জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শনির অশুভ দৃষ্টিবশতঃ রাজরোষে পতিত হন। তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল, বধার্থে তিনি মশানে পর্য্যন্ত নীত হয়েছিলেন। কিন্তু, শনির কৃপাদৃষ্টিতে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পান। শঙ্খপতি নামক এক সাধু বা বণিক শনির পূজায় আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করেন। কিন্তু, ধনগর্ব্বে তাঁর মতিচ্ছন্ন ঘটে। তিনি শনিপূজো ছেড়ে দেন। ফলে তাঁর ধন-সম্পৎ সবই চ'লে যায়। এমন কি মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে তিনি কারানিক্ষিপ্ত হন এবং তথায় তাঁর দুঃখের আর অবধি থাকে না। এ অবস্থায় পুনঃ পূজার দ্বারা শনি দেবকে প্রসন্ন ক'রেই তিনি বিপন্মুক্ত হন। প্রাগুক্ত কারণ ও দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য গ্রহের চেয়ে শনিগ্রহের সম্বন্ধেই মানুষের ভীতি সর্ব্বাধিক। এজন্য গ্রহপূজার মধ্যে শনি-পূজার ব্যাপকতাই বেশী। শনিবার সন্ধ্যায় বহির্গেহে তাঁর পূজো দিয়ে পাঁচালীর ব্রতকথা শুনে শিরনি প্রসাদ নিতে হয়। শোল মাছ খেলেও নাকি শনির দৃষ্টি থাকে না। বাহুতে সীসক ধারণও হিতকর।

পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর পেঁচো নামক এক শ্রেণীর শিশুঘাতী প্রেতাত্মার অধিদেবতা। অপদেবতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। পেঁচোভূতের কীর্ত্তি—আঁতুরের শিশুদের উপর উপদ্রব করা। পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুরের পূজায় পেঁচো ভূত ছেড়ে যায়।

পাঁচু ঠাকুরের নিকট ধরনা দিয়ে অনেক পুত্রহীনা পুত্রবতী হয়েছেন, বহু মৃতবৎসা জীববৎসা হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। "পঞ্চানন বাবু" বা "পাঁচুবাবু" ব'লে আজ যাঁরা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, জন্মেতিহাসে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পেঁচো ঠাকুরের বরাশিস্‌প্রাপ্ত—অনুসন্ধানে জানা গেলে আশ্চর্য্যের কিছুই থাকবে না। সদ্যোজাত শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য জাতাপহারিণীর পূজাও প্রচলিত আছে।

ভূতপর্ব্বের পর যমপর্ব্ব। যমভয় জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভয়। এর উপরে আর ভয় নেই। যমভয় থেকে পরিত্রাণই মুক্তি। মৃত্যুকে জয় ক'রে অমৃতত্ব লাভের আলোকদীপ্ত পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের তপঃসিদ্ধ ঋষি। মৃত্যু আসে জীবনের অমা অন্ধকারে গোপন অথচ নিষ্ঠুর পদসঞ্চার ক'রে। সে বিভীষিকাময় সান্দ্র অন্ধকারে জ্বেলে দিতে হয় অবিচ্ছিন্ন ও

অনির্ব্বাণ দীপশিখা। "আলোকামাবস্যা ব্রতের" বিধি বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে সেই কথাই বলেন। নারদ জান্‌তে চেয়েছিলেন—মহাঘোর অন্ধকারময় যমদ্বারে নিরাশ্রিত জীব কি ভাবে মুক্তি পেতে পারে—

যমদ্বারে মহাঘোরে অন্ধকারে নিরাশ্রয়ে।
তৎ কথং তীর্য্যতে ব্রহ্মন্ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥

ভবিষ্যপুরাণে যমভয় নিরাকরণের রহস্য যমরাজ স্বমুখেই বলেছেন। রাজ্ঞী চন্দ্ররেখা শিবভক্তিপরায়ণা ও পতিসেবানিরতা ছিলেন। মৃত্যুর পর যমকিঙ্করগণ তাঁকে কৃতান্তসমীপে নিয়ে যায়। চন্দ্ররেখা ভয়ে বেপমানা। কিন্তু, ধর্ম্মশীলা রাজ্ঞীকে সমীপাগতা দেখে যমরাজ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চান। চন্দ্ররেখা নরক নিবারণের কি উপায় জানতে উৎসুক। যমরাজ বলেন—**যমপুষ্করিণী** ব্রত কর, তাতে নরকভয় থাকে না—"যমপুষ্করিণী ভদ্রে ক্রিয়তাং ভক্তিভাবতঃ।"

যাঁরা ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা তাঁদের সম্বন্ধে যম নিত্যই শান্ত, সৌম্য, প্রসন্ন এবং বরদ, তিনি ভয়ঙ্কর ও শাস্তা তাদেরই সম্বন্ধে যারা অধর্ম্মাচারী ও পাপাত্মা।

ঐশ্বর্য্য এবং সৌভাগ্যের ক্ষেত্রে যেমন, যমভয় নিবারণের ক্ষেত্রেও তেমনি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত বুধাষ্টমী ব্রতের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ব'লে বর্ণিত। এই ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে বীর নামক ব্রাহ্মণের কৌশিক ও বিজয়া নামধেয় পুত্র ও কন্যা হারাণো বৃষভ খুঁজে পায়। শ্রীদুর্গার বরে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান লাভ করে বিশাল রাজাধিকার এবং ব্রাহ্মণতনয়ার বিবাহ হয় স্বয়ং যমরাজের সঙ্গে। অন্তিমে দ্বিজবর বীর ও তস্য পত্নী রম্ভা নরকে নিপতিত। কিন্তু, কন্যার গুণে মুক্তিলাভ করেন। যমরাজের উপদেশে বিজয়া গোপালিকার বেশে মথুরাপুরে উপস্থিত হয়ে আসন্নপ্রসবা গৌতমী নাম্নী ব্রাহ্মণীকে দিয়ে বুধাষ্টমী ব্রত করিয়ে তৎফল নরকে পচ্যমান্ পিতা-মাতাকে দিলে কৃতান্তের কৃপায় উভয়ের মুক্তি হয়।

দুঃখ ও বিপদ শুধু যে কয়েকটি বিশেষ চিহ্নিত উৎস থেকেই আসে তা নয়, মাঝে মাঝে এমন সব বিপত্তি এমন সব অজ্ঞাত সূত্র থেকে এসে উপস্থিত হয় যে, যাতে আমরা যৎপরোনাস্তি হতভম্ব হয়ে পড়ি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ সব বিপদ যেমন হঠাৎ আসে, তেমনি কার যেন গোপন করুণায় আবার হঠাৎ চলেও যায়। একটা দৃষ্টান্ত—

বিদর্ভরাজমহিষী গুণবতীর কি অদ্ভুত খেয়াল। তিনি গোমাংস দেখবেন। এক চর্ম্মকারপত্নীর সঙ্গে রাজ্ঞীর সখিত্ব ছিল। তিনি সখীকে মনের কৌতূহল ব্যক্ত ক'রে বলেন—"আঁচলে ঢেকে খানিকটা গোমাংস নিয়ে আসতে পার, আমি দেখবো!" গুণবতী হয়েও তাঁর দুর্গুণার মত আচরণ। কিন্তু, তাঁর সখি

এ সামান্য অভিপ্রায় কেন পূর্ণ করবে না ? সে গোপনে নিয়ে আসে খানিকটা গোমাংস। রাজ্ঞীর চক্ষুঃ হয়তো আপাততঃ জুড়ায়। কিন্তু, বিপদও দেখা দেয় কঠিনতম। রাজার এক অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য ঐ দৃশ্য দেখে ফেলে। সে রাজাকে গিয়ে অকপটে সব কথা জানায়। শুনেই তো রাজা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ। রাজপুরীতে নিষিদ্ধ গোমাংস ? এত বড় অনাচার ? মৃত্যু-আদেশই এ অনাচারের উপযুক্ত দণ্ড। হোক রাজ্ঞী, কিন্তু রাজার ধর্ম্মবিচারে সবাই সমান। সেখানে কোনও পক্ষপাত চলে না। রাজ্ঞী প্রাণ-দণ্ডেই দণ্ডিতা হন।

রাজ্ঞী স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি যে, এ ঘটনার পরিণাম এত দূর পর্য্যন্ত গড়াবে। আকস্মিক দুর্দ্দৈব। কিন্তু, পরিত্রাণের উপায় কি ? আর পরিত্রাণই বা করবেন কে ? সৌভাগ্যবশতঃ রাণীর জানা ছিল—বিপত্তারিণী দুর্গাই সকল বিপদে একমাত্র ত্রাণকর্ত্রী। দেবীর করুণা হ'লে তাঁর দৃশ্য বা অদৃশ্য ইঙ্গিতে যে কোন বিপদই দূর হয়ে যেতে পারে। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তা রাজ্ঞী দেবীর শরণ নেন। রাণীর কাতর প্রার্থনায় দেবীর করুণা হয়। অভয়া দর্শন দিয়ে বলেন—'ভয় নেই, তোর গোমাংস সব ফল ও পুষ্পে পরিণত হয়েছে।"

যে দুঃখ ও বিপদের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না, সে দুঃখ ও বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ—**নিস্তারিণীব্রত** বা **বিপত্তারিণীব্রত**। বাংলা দেশে এ ব্রতের অনুষ্ঠান অদ্যাপি প্রচলিত। রাজ্ঞী গুণবতীর বিপদ-নিস্তারের যে কাহিনীটি বলা হলো, তা এই নিস্তারিণী বা বিপত্তারিণী ব্রতেরই ব্রতকথা।

হিন্দুঘরের ধর্ম্মশীলা গৃহিণীদের বিশ্বাস—সকল অশুভ ও দুর্দ্দৈবের মূল হলো অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীই সংসারে আনে দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও কলহ। নিজেও ইনি কলহপ্রিয়া, পাপাচারিণী, কৃষ্ণবর্ণা, মলিনবসনা, স্থূলবদনা, লৌহালঙ্কার-ভূষিতা, রক্তনয়না, রূক্ষ পিঙ্গলকেশা এবং গর্দ্দভারূঢ়া। যেখানে বিবাদ, যেখানে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও বিচ্ছেদ, যেখানে কদাচার, সেখানেই অলক্ষ্মী*। এক রাজা অলক্ষ্মী কিনে নিয়ে কি বিপদে পড়ে'ছিলেন, তা লক্ষ্মীর বিশেষ এক ব্রতকথায় আমরা দেখেছি। পুরাণের উক্তি—বিষ্ণুর অনুরোধে ধর্ম্মজ্ঞ উদ্দালক এই কুরূপা ও দুর্গুণা রমণীকে বিবাহ করেন। কিন্তু, ধর্ম্মজ্ঞের সংস্পর্শেও ওঁর মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগে নি, অধিকন্তু ওঁর দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে ঋষি অবশেষে ওঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ হেন অলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ না করেন, সেজন্য ধর্ম্মশীলা গৃহিণীরা সদাই জাগ্রতা। তাঁরা নিত্য সদাচার মেনে চলেন, যাতে ক'রে অলক্ষ্মী গৃহপ্রবেশের

* অলক্ষ্মীর বিবরণ আছে লিঙ্গাপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদিতে।

কোনও ছিদ্র খুঁজে না পান। তা ছাড়াও অলক্ষ্মীকে কিছু পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে সে পূজায় আগমনী নেই, আছে নির্গমনী। "অলক্ষ্মী মেয়ে দূর করি, লক্ষ্মী এনে ঘর ভরি"—এই হলো এ পূজার শ্লোগান। অলক্ষ্মী বা অশুভ বিদায় গ্রহণ করলেই জীবন হয় নিশ্চিন্ত। মানুষের যুগ যুগ-ব্যাপী সাধনলব্ধ শুভ অবদানগুলি অনুকূল পরিবেশে সজীব ও সন্বর্দ্ধিত হয়ে মর্ত্ত্যেই সৃষ্টি করে এক দেবসমাজের। অশুভনাশ ও শুভের নিত্য প্রতিষ্ঠার এই যে বিপুল প্রয়াস এ'কে সার্থক ক'রে তোলাই ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণের মহৎ উদ্দেশ্য।

সাংখ্য দর্শনে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ব্রতাচরণের মাধ্যমে সেই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের চেষ্টা কি কি উপায়ে হয়েছে, মোটামুটি তার একটা ধারণা আমরা পেলাম। কিন্তু, দুঃখনাশই শেষ কথা নয়। দুঃখনাশের পর জীবনকে শূন্য রাখা যায় না। নিত্য সুখ ও আনন্দ লাভই জীবের পরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তার ছুটি নেই। অতঃপর আমরা দেখবো—কেবল প্রবৃত্তির প্রীতিতে ইন্ধন সংগ্রহের জন্যই নয়, নিবৃত্তির নিষ্ঠাও হিন্দুর জীবনকে ব্রতময় করেছে। শুধু ব্যষ্টিচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যের বিকাশ, প্রকাশই নয়, এ দু'য়ের সোপান অতিক্রম পূর্ব্বক যতক্ষণ ভূমার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পেরেছে, ততক্ষণ সে ব্রতাচরণ পরিত্যাগ করে নি। কঠোর সাধনা ও তপস্যার দ্বারা স্তরে স্তরে বিকশিত আত্মকুসুমটি চূড়ান্ত ভাবে ইষ্টের চরণে অঞ্জলিস্বরূপ নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে তবে সে লাভ করেছে পরমা তৃপ্তি।

সপ্তম অধ্যায়

ব্রতোৎসব ও নিবৃত্তিযোগের কথা

—:o:—

ক্ষণকালের জন্য গোড়ার কথায় ফিরে যাই। গ্রন্থের সূচনায় ধর্ম্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল। 'অভ্যুদয়' অর্থে ঐহিক সমৃদ্ধি এবং 'নিঃশ্রেয়স' অর্থে পারত্রিক কল্যাণ—প্রথমটি 'ভুক্তি', দ্বিতীয়টি 'মুক্তি', একটি প্রবৃত্তিমার্গের পথ, দ্বিতীয়টি নিবৃত্তিমার্গের পথ। আমরা এ ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম যে, হিন্দুর ব্রতপূজা ও পালপার্ব্বণের ভিতর দিয়ে অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্রেয়স লাভের বিপুল সম্ভাবনাও রয়েছে। সংসারের সহস্র প্রকার কামনাসিদ্ধির স্বার্থে প্রবৃত্তিমার্গের পথ ধ'রে অগ্রসর হ'লেও হিন্দুর ধর্ম্মীয় উৎসবগুলি এমন সুন্দর ছকে বাঁধা যে, পরিণামে তৎসমুদয় মুক্তির স্বার্থে নিবৃত্তির উন্নত ভূমিতে এনেই আমাদিগকে সংস্থিত করে। ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, ব্যাধিতে ঔষধ প্রয়োজন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এমন এক অতিমানসিক স্তরের সন্ধানও আমাদিগকে করতে হয়, যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি-ব্যাধি কিছুই নেই, কোন জাগতিক অভাববোধই যেখানে জাগে না। সেখানে কেবলই শান্তি, কেবলই আনন্দ, কেবলই পূর্ণতা। ধর্ম্মীয় সাধনার এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের জৈব সত্তাকে ভাস্বর রূপে তুলে ধরতে ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণের অবদান কতখানি, গ্রন্থের উপসংহারে সে কথাই আলোচিত হোক।

বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ বিষয়ক নানা আলোচনায় আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, সেখানে প্রবল ঢক্কানিনাদে ফলের কথাটাই যেন ফলাও ক'রে প্রচার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অভ্যুদয়ের সাধনাকে জয়যুক্ত ক'রে তোলার এক প্রবল আগ্রহ সমুদয় ব্রতোৎসবকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে বিরাজমান। ফলকামনা ছাড়া যেন কোন ব্রতপূজাই হতে পারে না। সকাম উপাসনায় কোনও দেবতা বা দেবীকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর কাছ থেকে সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের কিছু মূল্যবান্ প্রাপ্তি আদায় করা, মনে হয়, এই বুঝি ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির সর্ব্বমুখ্য উদ্দেশ্য। পরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কথাটি সেখানে যেন স্তিমিত। ফলকীর্ত্তনের অত বিচিত্র কল-কোলাহলের মধ্যে নিবৃত্তিযোগের আবেদনের ক্ষীণ ধ্বনি যেন প্রবৃত্তিবাদী মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশই করে না। কিন্ত এ কথা কি ঠিক? উত্তরে বলা যেতে পারে—না।

সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির উদ্দাম তাড়নায় জাগতিক ফল লাভের কথাটাই আগে শুনতে চায়, তাই ব্রতাচরণের এক বিশেষ পর্য্যায়ে সে কথাটা খুব বড় ক'রেই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু, সমগ্র বিষয়টি এমনই এক সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অনুকূলে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যে, তাতে ক'রে প্রবৃত্তির কল-কোলাহল অতিক্রমপূর্ব্বক সিদ্ধিকামী সাধক একদা অতি ধীরে অথচ অনিবার্য্য পদক্ষেপে নিবৃত্তির পরম শান্তিময় ভূমিতে উন্নীত হবেন। প্রবৃত্তির ভিতর দিয়েই নিবৃত্তির, ভোগের ভিতর দিয়েই বৈরাগ্যের, কামনার ভিতর দিয়েই নৈষ্কাম্যের এবং অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়েই নিঃশ্রেয়স লাভের ধ্রুব পথ রচনা ক'রে দিয়েছে হিন্দুর ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানসম্মত অনুষ্ঠাননিচয়। কি উপায়ে এবং কোন্ কোন্ স্তরানুক্রমে, সে কথাই বল্‌বো।

আমাদের ঘরে প্রচলিত ও আচরিত ধর্ম্মীয় উৎসবগুলির প্রকৃতি ও আচরণবিধি অনুধাবন করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে সমর্থ হই। যথা :—

(১) অনেক ক্ষেত্রে ব্রতোৎসবগুলির নামই খুব আকর্ষণীয়। যেমন, শক্তুসংক্রান্তি ব্রত, দধিসংক্রান্তি ব্রত, কলাছাড়া ব্রত, মধুসংক্রান্তি ব্রত, তালনবমী ব্রত, মিষ্টসংক্রান্তি ব্রত, অন্নসংক্রান্তি ব্রত, ফলসংক্রান্তি ব্রত, জলসংক্রান্তি ব্রত ইত্যাদি। এ সকল ব্রতের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের লালায়িত রসনা রসায়িত হয়ে উঠে—দধি, শক্তু, কদলী, মধু, মিষ্টান্ন, পিষ্টক, ফল, জল ইত্যাদি স্বাদু ভোগ্য বস্তুগুলির স্মৃতি আমাদের মনে উদিত হয়। বাস্তবেও দেখি, ক্ষেত্রব্রতের সঙ্গে দই-ছাতু, পৌষপার্ব্বণে পিঠে-পায়েস, সত্যনারায়ণের ব্রতে সিরনি-বাতাসা, লক্ষ্মীপূজায় নাড়ু-মোয়া, মা কালীর পূজায় জোড়া-পাঁঠা, শ্রীপঞ্চমীতে জোড়া ইলিস (পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত), তালনবমীতে তালের পিঠে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের অরন্ধন উৎসবের দিনেও ঘরে ঘরে পান্তা-ব্যঞ্জনের বিপুল প্রাচুর্য্য থাকে। প্রতিটি ব্রতোৎসব ও দেবপূজাতেই প্রসাদের ঘটা রাখা হয়। আমাদের নিত্যকার প্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলিই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে প্রসাদস্বরূপে আমাদের কাছে ফিরে আসে। ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি বর্জ্জনের এটি হলো প্রথম সোপান। আমাদের পোড়া পেটে জলন্ত বৈশ্বানরের অধিষ্ঠান যখন রয়েছে, তখন সে অগ্নির শান্তির জন্য ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণ করতেই হয়। কিন্তু, সে সকল ভোগ্য বস্তু যদি আমরা দেবতাকে অর্পণ ক'রে তাঁর প্রসাদজ্ঞানে ভক্ষণ করি তা হ'লে ভোগ ক'রেও ভোগপ্রবৃত্তির দ্বারা আমরা অভিভূত হই না।

(২) কোন কোন ব্রতোৎসবে দেখি, পূর্ব্ব দিবস সংযম, ব্রতের দিন উপবাস এবং তৎ পরদিন পারণের বিধান। মাঝে মাঝে ভোগবিরতির উদ্দেশ্যেই এ বিধান প্রবর্ত্তিত।

(৩) কোন কোন ব্রতে নানবিধ আহারের নিয়ম স্থাপন করা হয়েছে। হয় কোনও বিশেষ দ্রব্য খেতে নিষেধ করা হয়েছে, নয় তো কোনও হিতকর দ্রব্য খেতে বলা হয়েছে। ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে এই যে নানা ধরণের বিধি-নিষেধ, ভোগপ্রবৃত্তিকে জয় করার অন্যতম উপায় স্বরূপেই তা পরিকল্পিত, এ কথা বুঝতে আমাদের কোনও কষ্ট হয় না।

(৪) দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রতী বা ব্রতিনী দেব-পূজার পর ব্রাহ্মণ, পূজনীয় ব্যক্তিগণ, আত্মীয়বৃন্দ ও অতিথিবর্গকে অগ্রে তৃপ্ত না করিয়ে স্বয়ং ভোজন করেন না। ব্রতের বিধানেই অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অনুশাসন স্পষ্টতঃ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ভবিষ্য পুরাণোক্ত অন্নসংক্রান্তি ব্রতের নিয়মে বলা হয়েছে, অগ্রে দেবতাকে ও তৎপরে ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দ্রব্য উৎসর্গ ক'রে উভয়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবে ভোজন করবে।* তালনবমী ব্রতে ব্রতিনীকে দেবোদ্দেশ্যে পিষ্টক উৎসর্গ করতে হয়, পরে ব্রাহ্মণ ও নিজ স্বামীকে পরিতৃপ্তি সহকারে পিষ্টক খাওয়াতে হয়। এ'দের সন্তোষ বিধান করা হ'লে পর ব্রতিনী স্বয়ং আহার করেন।†

এ সকল নিয়মও সংযমশিক্ষার সুন্দর উপায়।

(৫) ব্রতকথার আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে ভোগ ও স্বার্থপরতার দুঃখময় অভিশাপ এবং ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতার সুখময় আশীর্ব্বাদের কথা নানা চরিত্রের দৃষ্টান্ত সহায়ে বার বার কীর্ত্তিত। পাপ ও পুণ্য, আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের পার্থক্যও দেখানো হয়েছে। এতে স্বভাবতঃই মানুষ নিবৃত্তির পথ অনুসরণের প্রেরণা লাভ করে—পুণ্যাচরণ ও ভগবদারাধানায় উৎসাহিত হয়।

(৬) চৈত্রমাসে গাজনের সন্ন্যাস এবং গুরুদশায় হবিষ্যান্নাদির ভোজন প্রত্যক্ষতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতনিষ্ঠার পরিচায়ক। ধর্ম্মঠাকুরের সন্ন্যাসের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৭) জন্মাষ্টমী, দুর্গানবমী, রামনবমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে উপবাসাদির সহিত রাত্রি জাগরণের বিধান। এ তপস্যায় তমোনাশ হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যেও রাত্রি জাগরণ বিধেয়। এ'কে মোক্ষপ্রদ বলা হয়েছে। গরুড় পুরাণে আছে, নিষাদরাজ সুন্দর সেন শিকারে বেরিয়ে রাত্রে এক বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করে। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। তার অজ্ঞাতসারেই বৃক্ষনিম্নস্থ শিবলিঙ্গে একটি বিল্বপত্র পড়েছিল, হাতের বাণটি সহসা পড়ে গেলে

---

* সদক্ষিণানি ভোজ্যানি দদাচ্চৈব দ্বিজাতয়ে।
বিপ্রাণাং আশিসং নীত্বা ততস্তান্ ভোজয়েন্মুদা॥

† দেবায় পিষ্টকং দত্বা ব্রাহ্মণায় ততঃ পরম্।
স্বামিনং ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত পিষ্টকম্॥

সেটি নতজানু হয়ে তুল্‌তে গিয়ে শিবলিঙ্গে প্রণাম নিবেদন হয়ে যায়, অপরিষ্কৃত স্থানটি পরিষ্কার করতে গিয়ে শিবলিঙ্গের মস্তকে কিছুটা জলও ছিট্‌কে পড়ে, আর রাত্রি জাগরণ তো হয় স্বাভাবিক ভাবেই। এ পুণ্যের ফলেই মৃত্যুর পর তার শিবলোক প্রাপ্তি হয়। প্রায় এ ধরণের আরো দুটি উপাখ্যান শিবপুরাণে আছে। ভিল্ল নামক এক ব্যাধ এবং বেদনিধি নামক এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শিবরাত্রির জাগরণ এবং শিবপূজার অন্যান্য ক্রম অনুসরণ ক'রে অন্তিমে যমভয় থেকে পরিত্রাত।

(৮) কোন কোন ব্রতে মৌনাবলম্বনের বিধি আছে। সন্ধ্যামণির ব্রতে ও সঙ্কটার ব্রতে যথাক্রমে সন্ধ্যায় সাতটি তারা না দেখা পর্য্যন্ত এবং আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মৌন থাক্‌তে হয়, মৌনী অমাবস্যাতেও মৌন থেকে স্নান বিধেয়। এর মধ্যে বাক্‌সংযম বা বাচিক তপস্যার ভাবটিই নিহিত।

(৯) অনেকগুলি ব্রত-পার্ব্বণেরই উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণাদিকে বিশেষ বিশেষ বস্তু দান করা বা জনহিতার্থে কোনও শুভকার্য্যের সূচনা করা। এ সকল সদনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও ত্যাগব্রতের শিক্ষাই লাভ করা যায়।

এরূপ নানামুখী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের ব্রতপূজা ও পাল-পার্ব্বণসমুদয়ের ভিতরে নিবৃত্তিযোগের আবেদনটি অস্পষ্ট তো নয়ই, বরং অতিশয় সুস্পষ্ট। অবশ্য মানুষ প্রথমে ভোগে প্রমত্ত হয় তার সহজাত জৈবী প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই। এ প্রবৃত্তির চাহিদা না মিটিয়ে হঠাৎ তার কণ্ঠরোধ করতে যাওয়া বিজ্ঞানসম্মত পথ নয়। এ'কে গলা টিপে মারতে যাওয়া মূর্খতারই নামান্তর। চাই—এর কল্যাণময় রূপান্তর। ব্রতোৎসবগুলি নিবৃত্তির দীপশিখা জ্বালিয়ে ভোগোন্মত্ত মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে সেই কল্যাণের পথই দেখায়।

আমরা দেখেছি, ব্রত-পূজাদিতে খুব ঘটা ক'রেই ফলের কথাটা বলা হয়। মনে হয়, বুঝি ফললাভই ব্রত-পূজাদির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠিক তা নয়, আরো মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তবে ব্রত-পূজা ও পালপার্ব্বণাদিতে যাতে মানুষের রুচি ও আগ্রহ জাগে তজ্জন্যই নানাবিধ পুষ্পিত বচনে ফলকীর্ত্তন করা হয়। রোচনার্থে ফলশ্রুতি। জাগতিক সুখৈশ্বর্য্য এবং মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তির উদগ্র কামনা নিয়েই হয়তো ব্রতী বা ব্রতিনী প্রথম ধর্ম্মীয় উৎসবাদিতে উৎসাহিত ও নিয়োজিত হয়, কিন্তু সোপানানুক্রমে তার সেই কামনা পরিশোধিত হয়ে পরম মুমুক্ষুত্বের রূপ ধারণ করে। কি ভাবে ধাপে ধাপে জাগতিক কামনার উন্নততর ও মহত্তর রূপান্তর ঘটে, তা আমলকী দ্বাদশী ব্রতের দৃষ্টান্ত গ্রহণে ব্যাখ্যাত হ'তে পারে।

আমলকী বা ধাত্রী একটি বিশেষ উপকারী ফল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মতে ইহা ত্রিদোষনাশক, অত্যন্ত বৃষ্য ও রসায়ণ এবং অন্য নানাবিধ প্রশংসনীয় গুণসম্পন্ন। আমলকী দ্বাদশী ব্রতে তন্নামক ফলবিশেষটিই হলো প্রধান উপকরণ। অনেক ফলের কথা ব'ল্‌তে হবে ব'লেই বোধহয় এরূপ একটি উপযোগী ফলকে ব্রতোপকরণরূপে বেছে নেওয়া হয়েছে। ধাত্রী ফলকে প্রতীক স্বরূপ ধ'রে প্রথমে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, দ্বিতীয়ে গঙ্গাস্নানোপলক্ষ্যে সহস্র গোদানের ফল, তৃতীয়ে কোটী শিবলিঙ্গপূজার ফল, চতুর্থে সহস্র চান্দ্রায়ণব্রতের ফল, পঞ্চমে স্বর্গফল এবং এরূপ অন্য বহুতর ফলের কথা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলা হয়। ফলের ফলাও বিবরণ লক্ষ্য করুন।

ধাত্রীঞ্চ শিরসা ধৃত্বা স্নানার্থং যদি গচ্ছতি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমেতি যুধিষ্ঠির॥
গঙ্গায়াং গোসহস্রস্য সম্যক্ দানেন যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ধাত্রীদানেন সর্ব্বদা॥
কোটিশঃ শিবলিঙ্গস্য গঙ্গায়াং পূজনে ফলম্।
ততোঽধিকং ফলঞ্চৈব ধাত্রীস্নানেন সর্ব্বদা॥

স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আমলকী দ্বাদশী ব্রতের ফলের সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বল্‌ছেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধাত্রীফল মাথায় নিয়ে যদি স্নানার্থ গমন করা যায়, তবে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। গঙ্গাতটে সহস্র গোদানের যে সম্যক্ ফল তা সমস্তই ধাত্রীফল দানের দ্বারা সর্ব্বদা পাওয়া যায়। কোটী শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাপূজনে যে ফল, ধাত্রীস্নানে তদপেক্ষাও অধিক ফল লভ্য।" বিভিন্ন স্তরের এত সব ফলের কথা বলার পরও যেন ফলকীর্ত্তনকারের চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি নেই। ব্রতের অন্তিম ফল মোক্ষ বা পরমা গতি—একথাটি ব'লে তবে বিশ্রাম। শুনুন, সেই কথা।

সংযমে পারণে চৈব সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
কেবলং ভক্ষয়েৎ ধাত্রীং মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥
ধাত্রীতরুতলে স্থিত্বা দেহত্যাগং করোতি যঃ।
দিব্যবিমানমারূঢ়ঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥

সংযমে, পারণে ও হরিবাসরে যিনি কেবল ধাত্রীফল ভোজন করেন, মুক্তি তাঁর করতলগত; ধাত্রীতলে শয়ন ক'রে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরমা গতি লাভ করেন। ধাত্রী ফলের এবম্বিধ উচ্চ বিজ্ঞাপন অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হবে। আসলে ধাত্রীফলটি উপলক্ষ্য মাত্র। এর ভিতর দিয়ে

মানুষের ক্রমোন্নত সঙ্কল্পনিচয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহের চেষ্টা পেয়েছে এবং
অন্তিমে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য মোক্ষ বা পরমা গতির সন্ধান করেছে।

শুধু আমলকী দ্বাদশী ব্রতের কথা নয়—এই মুক্তির বার্ত্তা অন্যান্য
ব্রতাদিতেও দৃপ্ত কণ্ঠে বিঘোষিত। অন্নসংক্রান্তি ব্রতে অন্নদানের প্রশংসান্তে
বলা হয়েছে, এ ব্রতের ফল মুক্তি—"মুক্তোঽভবৎ ব্রতং কৃত্বা চান্নসংক্রান্তিনাম-
কম্।" ধর্ম্মঘট ব্রতের ফল—ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে পরমা গতি বা
মুক্তি—"ইহলোকে সুখী ভূত্বা পরত্র গতিরুত্তমা।" যমপুষ্করিণী ব্রতে ব্রতিনী
ইহলোকে পুত্র-পৌত্রাদি লাভ ক'রে অন্তিমে শ্রীহরির চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়—"অন্তে
যাতি হরেঃ পদম্।" ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসব-
গুলিতে জাগতিক কামনার চেয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভের আবেদন অধিকতর
পরিস্ফুট। বিপত্তারিণী ব্রতে ঐহিক ভোগ ও শত যজ্ঞের পুণ্যফল ভোগান্তে
ব্রতিনী অন্তিমে দেবী জগন্ময়ীর অভয় ক্রোড় লাভ করে—"যাত্যন্তে পরমাত্মা-
দৈর্যত্র দেবী জগন্ময়ী।" মঙ্গলচণ্ডী ব্রতেরও অন্তিম ফল কৈলাসপ্রাপ্তি—"যাত্যন্তে
চণ্ডিকালয়ম্।" পিপীতকী দ্বাদশী ব্রতের ঐহিক ফল পুত্র-পৌত্র ও ধন-ধান্যাদি
লাভ, কিন্তু পারত্রিক ফল মুক্তি—"পুত্রপৌত্রৈঃ সমাযুক্তো ধনধান্য-সমন্বিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥" মুক্তি, পরমা গতি বা পরমা
নিবৃত্তির এই যে ঐকান্তিক আবেদন তা শুধু পৌরাণিক ব্রত-পূজারই একক
মর্ম্মকথা নয়, পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রতাদির ছেলেভুলানো
ছড়ার মধ্যেও মুমুক্ষুর প্রাণফাটা আর্ত্তি আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি।
কুমারীদের আচরণীয় পুণ্যিপুকুর ব্রতের কথা হয়তো আমাদের স্মরণে আছে।
পুণ্যাচরণের উদ্দেশ্য কেবল ইহলোকে সুখপ্রাপ্তি নয়, অন্তিমে পরম আশ্রয়
লাভ। পুণ্যিপুকুরে জল ঢেলে কুমারীরাও বলে—"অন্তিম কালে দিও স্থল।"
এই যে অন্তিমের ভাবনা, এ ভাবনাই মানুষকে নিবৃত্তিধর্ম্মে দীক্ষা দান করে।
অন্তিমের চিন্তা যতই প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়, জাগতিক তুচ্ছ ভোগের প্রতি
ততই জাগে বিশুদ্ধ বৈরাগ্যবুদ্ধি। নানাবিধ ব্রত-পূজার আচরণের মধ্য দিয়ে
চিত্তশুদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধেও সাধকের ধারণা পরিচ্ছন্ন
হয়। তখন জাগতিক বিষয়-কামনাকে একান্ত পরাভূত ক'রে একটি মাত্র
পরম কামনাই সাধকের মানস চেতনায় বলিষ্ঠ মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়—সে
হলো মুক্তিপ্রাপ্তি, স্বকীয় ক্ষুদ্র সত্তাটিকে সেই পরমাত্মার চরণে সমর্পণ ক'রে
দিয়ে নিত্য আনন্দের অধিকারী হওয়া। কোনো কোনো ব্রতোৎসবে এই
মুক্তির কথাটাই মুখ্য, ভুক্তির কথাটা গৌণ।

অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত এমনি এক ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান। দারিদ্র্য নাশের কথা
এ ব্রতেও আছে। কিন্তু, তথায় অনন্তরূপ ভগবচ্চরণে লীন হওয়ার আস্পৃহা
যেন অধিকতর উদগ্র। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে এ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

এ ব্রতের উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অনন্ত। তাঁর রূপের কোনও অন্ত নেই ব'লেই তাঁর এই নাম। অনন্ত সংসারসমুদ্র হ'তে তিনিই জীব মাত্রের মুক্তিদাতা। মুনিসত্তম কৌণ্ডিল্য এই অনন্তদেবের দর্শন মানসে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করেন। বনের পশু, বৃক্ষ ও তড়াগাদি'কে কেঁদে কেঁদে শুধান—"তোমরা কি অনন্তদেবের বার্ত্তা জান?" কোথাও তাঁর সন্ধান না পেয়ে "শ্রীমন্নাথ পরিত্রাহি" ব'লে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে আছড়ে পড়েন। কৌণ্ডিল্যকে নির্ব্বোদপ্রাপ্ত জেনে অনন্তদেব তাঁকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন। অনন্তের স্বরূপমূর্ত্তি দর্শনে কৌণ্ডিল্যের জীবন ধন্য হয়। ইহলোকে দারিদ্র্যহীন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ জীবন যাপন ক'রে অন্তিমে তিনি সালোক্যমুক্তি প্রাপ্ত হন। অতএব, ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণ সমুদয় অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়বিধ সিদ্ধির উপায়ভূত সামগ্রিক ধর্ম্মীয় সাধনার আশ্রয়স্বরূপ, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। পঞ্চম বর্ষীয়া কুমারী থেকে আরম্ভ ক'রে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত প্রতিটি মানুষকে তাদের বয়স, রুচি, মেধা ও শক্তি অনুরূপ ধর্ম্মীয় সাধনার পথ প্রদর্শন করতে পারে আমাদের ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণগুলি। বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ প্রয়োজনেই এদের উদ্ভব। বলিষ্ঠ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ব্রত-পার্ব্বণাদির উপযোগিতার প্রশ্নটিকে দৃঢ়রূপে তুলে ধরতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। কুসংস্কার, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় ও ছেলেখেলা ব'লে এ গুলিকে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি অনেকাংশেই এ সকল ব্রত-পার্ব্বণাদির উপর নির্ভরশীল। জাতির আত্ম-চৈতন্যের জাগরণে, জাতীয় ঐক্যের সংসাধনে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে ধর্ম্মের উপযোগিতা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অনুভব করবেন, এ-ক্ষেত্রে ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণাদির ভূমিকা কত অপরিহার্য্য ও সুফলদায়ী।

উপসংহার

গ্রন্থের উপসংহারে কামনা এই, আমাদের গৃহে গৃহে আবার সংস্থাপিত হোক ব্রতপূজার আম্রপল্লবসংযুক্ত মাঙ্গলিক পূর্ণ ঘট, সাধ্বী ললনাগণের কুশলকরাঙ্কিত চারু আলিম্পনের বিমল শোভায় আবার হাস্যময় হয়ে উঠুক আমাদের গোময়পরিলেপিত শুদ্ধ আঙ্গিনাগুলি, বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত মধুর হুলুধ্বনি ও শুভ শঙ্খনাদে জেগে উঠুক আমাদের অন্তরের সুপ্ত আত্মসম্বিৎ, সরলা বালিকাদের কচি কচি কণ্ঠে সমস্বরে আবার যেন গীত হয় ব্রতের বিচিত্র ছড়াগান. কল্যাণময়ী প্রবীণা ব্রতচারিণীদের পুরোভাগে বসে আমরা আরও বেশী ক'রে শুন্‌তে চাই আশ্চর্য্য শিক্ষাপ্রদ, শ্রুতিসুখকর সহস্র ব্রতোপাখ্যান, তার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা কাংস্য-ঘণ্টা-ধ্বনি যেন স্তব্ধ না হয়। বারো

মাসে তেরো পার্ব্বণের ব্যাপক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি নূতন প্রাণশক্তির বিশ্বগ্রাসী বীর্য্য নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করুক। হিন্দুর ভেদ-বিভেদ, দৌর্ব্বল্য ও আত্মদৈন্য ঘুচে যাক। তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের নানামুখী অভীপ্সাগুলি ধর্ম্মীয় বুদ্ধির আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ মূর্ত্তি লাভ ক'রে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, সংহতি ও প্রতিরক্ষাদির উন্নততর ব্যবস্থার আকারে প্রবর্ত্তিত হয়ে পরিণামে তার রাষ্ট্রীয় সাধনাকে জয়যুক্ত ক'রে তুলুক। ব্রত-পার্ব্বণাদির নিত্য-নৈমিত্তিক আচারনিষ্ঠার প্রভাবে আমাদের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যগুলিকেও যেন আমরা নূতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, মাতা-সন্তান, ভ্রাতা-ভ্রাতা ও আত্মীয়-আত্মীয় একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ত্যাগ, সেবা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রেম ও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে ইহ সংসারকেই স্বর্গীয় সুষমায় ভরে তুলতে সমর্থ হই। যদিও আমরা জানি, জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয় না, দুঃখের সুতীব্র দহনেও মানুষকে মাঝে মাঝে দগ্ধ হতে হয়, কিন্তু ব্রত-পূজাদিতে দেবতার অসীম করুণা লাভ ক'রে আগত বা অনাগত যে কোন শ্রেণীর বিপত্তি ও দুঃখের সঙ্গে বীর্য্যবিক্রমে সংগ্রামপূর্ব্বক আমরা যেন ধর্ম্মীয় সাধনার বিজয় ঘোষণা করতে পারি। সমুদয় ব্যাবহারিক কাম্য বস্তু লাভ ক'রে অঋণী, অশোক ও অদীন হয়ে ইহজীবনেও যেন আমরা সুখী হই এবং নিষ্কাম নিবৃত্তিযোগের মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক পরলোকেও যেন লাভ করি পরম বিশ্রাম। আমাদের ব্রতাচরণ, পূজা ও তপস্যা যেন সকল দিক থেকেই হয় সফল।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

হিন্দুজনসাধারণের কর্ত্তব্য

——:#:——

১। সার্ব্বজনিক পূজার নামে আজকাল চল্‌ছে প্রচুর অপব্যয়, অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হাল্‌কা নৃত্য-গীত-নাটক-সিনেমা। এ সকলই অনর্থবহুল এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আকর তথা সমাজ ও পরিবার ধ্বংসের প্রত্যক্ষ হেতু। এই সব বন্ধ করুন। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হিন্দুর ঘরে ঘরে হোক, সার্ব্বজনিক ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া আরো বাঞ্ছনীয়। বালক, যুবক, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হোন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—মূল উদ্দেশ্য যেন অব্যাহত থাকে, শুচিতা ও গাম্ভীর্য যেন নষ্ট না হয়। অন্তরে শ্রদ্ধা ভগবদ্ভক্তি জাগে, ত্যাগ-সংযম-সত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, সমাজকল্যাণের ভাবটি উদ্দীপিত হয়,—পূজোৎসবের কার্য্যক্রম সেই ভাবেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

২। ছোট ছোট কুমারীদিগকে ব্রতাচরণে উৎসাহ দিন। এ বিষয়ে অভিভাবক ও অভিভাবিকাদিগের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরাও চরিত্র গঠনের সহায়করূপে ছাত্রীদিগকে ব্রতাচরণ শিক্ষা দিতে পারেন। নৃত্যগীত, রান্না-বান্না, সেলাই-ফোঁড়াই, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক কিছুই তো তাঁরা শিখাচ্ছেন। শিক্ষাদানের অন্যতম অপরিহার্য্য বিষয়রূপে ব্রত-পার্ব্বণগুলি গ্রহণে আপত্তি কি?

৩। সধবা কন্যা, পৌত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে ব্রতপরায়ণা ক'রে তুলুন। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং আচরণ ক'রে তাদিগকে অনুপ্রাণিত করবেন। গৃহকর্ত্তাও এ জন্য উৎসাহ দিতে ও আবশ্যকীয় অর্থাদি ব্যয়ে যেন কুণ্ঠা বোধ না করেন।

৪। বিধবারাও মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তথা বৈধব্যোচিত ত্যাগ, সংযম, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য পালনের স্বার্থে বারব্রতগুলি মেনে চলুন। কুমারী এবং সধবাদিগকেও নিজ নিজ ব্রতাচরণে তাঁরা উৎসাহ দিন ও সাহায্য করুন।

৫। সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দুর ব্রত-পূজা ও পাল-পার্ব্বণগুলিকে সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপক আকারে প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে হিন্দু মিলন-মন্দিরের শাখা স্থাপন করুন। এতদুদ্দেশ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

——:#:——